কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

জানুয়ারি ৮৩

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন সুজিত কুণ্ডু

এডিট করেছেন অপ্টিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোন পুরনো পত্রিকার কোন সংখ্যা থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের এই অভিযানে সঙ্গী হতে চান তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

নিমোর বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ল একটি দুর্লভ স্তন্যপায়ী জীব।
এ যে দেখছি বিরাট এক সামুদ্রিক ভোঁদড়!
আবার শুরু হল চলা ...
হঠাৎ ক্যাপ্টেন নিমো ও তাঁর অনুচর প্রফেসর ও কনসীলকে নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন।
ঠিক তখুনি দুটি বিশাল হাঙর চলে গেল ওঁদের উপর দিয়ে।
ইস্, খুব জোর বেঁচে গেছি!
গৌতম
হাঁটতে হাঁটতে কেটে গেল আরও অনেক ক্ষণ।
ঐ তো নটিলাসের আলো! আমরা পৌঁছে গেলাম।
শেষ হল ক্রেস্পো দ্বীপের অভিযান। জলের ভিতর প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে আবার শুরু হল নটিলাসের যাত্রা।

চিঠিপত্র

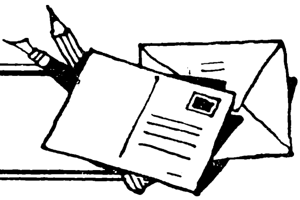

প্রসঙ্গ ! নেপচুনের আবিষ্কর্তা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকা মহলে একটা প্রশ্ন জেগেছে—কে নেপচুন গ্রহের প্রকৃত আবিষ্কারক—জন অ্যাডাম অথবা লিভেরিয়ার? তারা নানা বিজ্ঞান বইতে অথবা 'বুক অব নলেজে' বিভিন্ন ধরনের জবাব পাচ্ছে। তাই তাদের মন থেকে সংশয় আর ঘুচতে চাইছে না। আমি এখানে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে চাই। তা হলেই তাদের মন থেকে সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে।

তোমরা জানো, ইউরেনাস গ্রহটি আবিষ্কার করেছিলেন উইলিয়াম হার্শেল। তিনি কিন্তু মোটেই বিজ্ঞানী ছিলেন না, অথবা অংকশাস্ত্রেও তাঁর কোনোরূপ দখল ছিল না। তিনি ছিলেন অতি সাধারণ একজন সঙ্গীতজ্ঞ বা ব্যাণ্ড বাজনা বাদক। জাতিতে জার্মান। হুজুগের বশে ভাগ্যক্রমে করে ফেললেন এত বড় একটা আবিষ্কার।

হার্শেল-পরিবার পুরুষানুক্রমে ব্যাণ্ড বাজনার কাজে লিপ্ত। জার্মানীর রাজা জর্জ উত্তরাধিকার সূত্রে ইংলণ্ডের সিংহাসনের অধিকারী হলেন। রাজা হয়ে তিনি হার্শেলকে ইংলণ্ডে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর ভগিনী কারোলিনাও দাদার সঙ্গে চলে এলেন এবং বিলেতের নানা স্থানে ঘুরে তাঁর সঙ্গীতকলা প্রদর্শন করতে লাগলেন। একবার তাঁর মনে আকাশের তারা সম্বন্ধে প্রচণ্ড কৌতূহল জাগে। তক্ষুণি ভাড়া করে আনলেন একটা দূরবীন। দূরবীনে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তারাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর আর আনন্দ ধরে না। অদম্য উৎসাহ আর অধ্যবসায়ের ফলে নিজেই তৈরী করে ফেললেন আরো উন্নত ধরনের দূরবীন। আর তাই দিয়ে রাত জেগে আকাশের তারার মানচিত্র তৈরীতে লিপ্ত হলেন। তাঁর বোন সেই তারাগুলির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে লাগলেন। তারারা সব নিশ্চল। তারা স্থান পরিবর্তন করে না এবং উন্নত ধরনের দূরবীনেও তাদের আকৃতির কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু তিনি হঠাৎ দেখতে পেলের এই বিন্দু বিন্দু তারার মধ্যে একটি তারা তাঁর দূরবীনে একটা থালার আকার নিয়েছে। বুঝলেন এ তারা অতি নিকটের প্রতিবেশী। বিজ্ঞানী মহলে তক্ষুণি সাড়া পড়ে গেল। এ তারা একটি গ্রহ ছাড়া কিছু নয়। আবিষ্কার হলো সূর্যের একটি নতুন গ্রহ—ইউরেনাস।

বিজ্ঞানী মহল তক্ষুণি লেগে গেলেন এর পরিক্রমা-পথ আবিষ্কারে। পুরনো তারার ম্যাপগুলি পর্যালোচনা করে বোঝা গেল, এর আগে অন্ততঃ বিশবার তারাটিকে নানাস্থানে দেখা গেছে। কিন্তু গ্রহ বলে তাকে কেউ সন্দেহ করে নি। এবার যখন ধরা পড়েছে, তখন তার গতিপথ বার করতেই হবে।

কিছু আগে মহাবিজ্ঞানী নিউটন গ্রহদের মহাকর্ষ সূত্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সেই সূত্র ধরেই চললো এই নতুন গ্রহ উউরেনাসের প্রদক্ষিণ পথের অনুসন্ধান। নিছক অঙ্কের ব্যাপার এসব।

কিন্তু অঙ্কের সঙ্গে এর প্রদক্ষিণ পথের যে যথেষ্ট গরমিল দেখা যাচ্ছে। তা হলে কি মহাবিজ্ঞানীর সূত্রেই কোনো ত্রুটি রয়েছে? অথবা গ্রহটি মহাকাশের অন্য কোন জ্যোতিষ্কের আকর্ষণে তার নির্ধারিত পথ থেকে কিঞ্চিৎ সরে যাচ্ছে? শেষোক্তটিই তবে সম্ভব হতে পারে।

বিশাল মহাকাশের কোন্ সে জ্যোতিষ্ক যা এই গ্রহটিকে পথভ্রষ্ট করছে! কিন্তু নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র আর তাঁর অঙ্কের কাছে তার আর আত্মগোপনের শক্তি নেই। ধরা তাকে পড়তেই হবে।

জন অ্যাডাম এক তরুণ বিজ্ঞানী। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আনকরা স্নাতক। সে বছরের সিনিয়র র‍্যাংলার। অঙ্কের ট্রাইপসে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী। নিছক কাগজ পেন্সিলের সাহায্যে তিনি সেই অদৃশ্য শক্তিকে নির্ভুলভাবে খুঁজে বার করতে সমর্থ হলেন। নিখুঁত তাঁর হিসেব, সঠিক তাঁর অনুমান। তিনিই প্রথম ঠিক ঠিক বলে দিলেন এই অদৃশ্য শক্তির আয়তন অবস্থিতি আর পরিক্রমা পথের নিশানা। কিন্তু গ্রহটিকে দূরবীনে খুঁজে বার করতে হবে তো। তক্ষুণি তিনি চিঠি লিখে ইংলণ্ডের রাজকীয় জোতির্বিদকে (Astronomer Royal) অনুরোধ জানালেন কোথায় কখন কিভাবে তাঁর দূরবীন-যন্ত্রটি লক্ষ্য বস্তুটির প্রতি নির্দেশ করবেন তিনি।

রাজকীয় জ্যোতির্বিদের তক্ষুণি তাঁর অনুরোধে আন্তরিকতার সঙ্গে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা তিনি দিলেন না। অহরহ তিনি এ ধরনের অনুরোধ পেয়ে পেয়ে অতিষ্ঠ, যার বেশির ভাগই ভুয়ো। তিনি চিঠির জবাবে তরুণ বিজ্ঞানীকে জানালেন,

'আপনার নতুন গ্রহটি এমন কি বলছে, যা আপনি বুঝতে পারছেন না ? অ্যাডাম রসিকতা বুঝতে পারলেন। তিনি দমে গেলেন, তাঁর উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেল। এ নিয়ে আর মিথ্যাবাদ প্রতিবাদ করতে গেলেন না।

এর ঠিক আট মাস পরে ঐ রাজকীয় জ্যোতির্বিদ ঠিক অনুরূপ আর একটি অনুরোধপত্র পেলেন ফ্রান্স থেকে। ইনিও এক তরুণ বিজ্ঞানী, নাম লিভেরিয়ার। তিনিও চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছেন দূরবীনটি কখন কোথায় কীভাবে স্থাপন করবেন। আশ্চর্য ! লিভেরিয়ারের স্থান নির্দেশ এবং অ্যাড্যমের স্থান নির্দেশ একেবারে কাছাকাছি। রাজ-জ্যোতির্বিদ একবার একটু নড়ে বসলেন যেন। তাই-তো ! তা হলে দেখতেই হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই এক-গাদা কাজ নিয়ে তিনি এত ব্যস্ত যে তার দূরবীনের এতটুকু ফাঁক নেই এদিকে মন দেবার। তবু তিনি চিঠি লিখে কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের প্রফেসরকে অনুরোধ জানালেন তাঁর হয়ে কাজটি করে দিতে। প্রফেসর অবহেলা করলেন না, তিনি তক্ষুণি তার দূরবীনকে নির্দেশিত লক্ষ্যে স্থাপন করলেন এবং তারাগুলির অবস্থানও লিপি-বদ্ধ করলেন। কিন্তু কীভাবে বুঝবেন কোন্ তারাটি আগন্তুক গ্রহ ! তাঁর কাছে তখন কোনো ভালো তারার মানচিত্র ছিল না। কাজেই কেম্ব্রিজের প্রফেসর নিরুপায় হয়ে পড়লেন। দুর্ভাগ্যই বটে !

কিন্তু লিভেরিয়ার অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি অত অল্পে অ্যাডামের মতো হতোদ্যম হলেন না। তক্ষুণি তিনি বার্লিন মানমন্দিরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত যিনি, তিনি তক্ষুণি তাঁর দূরবীন যন্ত্রটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিবদ্ধ করলেন আর সদ্যসমাপ্ত এক নতুন তারার মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে সেই অজানা গ্রহটিকে চিহ্নিত করে ফেললেন। এইটিই নতুন গ্রহ নেপচুন।

সারা ইউরোপ জুড়ে হৈ হৈ ব্যাপার পড়ে গেল ! লিভেরিয়ার নেপচুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন ! পৃথিবী-জোড়া লোকের মুখে মুখে ওই এককথা !

ইংলণ্ডের রাজকীয় জ্যোতির্বিদের আর আফশোসের অন্ত রইলো না ! হায় হায় ! নিজেদের গাফিলতির জন্যেই পাওয়া জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেল। এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারের গৌরব পেয়েও পাওয়া গেল না। ফ্রান্সের কাছে দৌড়ে হেরে গেল ইংলণ্ড !

কাগজে-কলমে এই আবিষ্কারের গৌরব লিভেরিয়ারেরই প্রাপ্য। কিন্তু গোটা পৃথিবী তো জানে প্রকৃত ঘটনা। তাই সবাই জন অ্যাডামকেই নেপচুনের প্রথম আবিষ্কারক হিসাবে সম্মান দিয়ে থাকে।

ধীরেন বল
21/2, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-37

[এই প্রসঙ্গে আর চিঠিপত্র ছাপা হবে না।
সম্পাদক, কিঃ জ্ঞাঃ বিঃ]

বিজ্ঞান-সংবাদ

গোপীবল্লভপুরে বিজ্ঞান আলোচনাচক্র

গত আগস্ট মাসে গোপীবল্লভপুরে এক নম্বর ব্লক যুবকরণ তথ্যকেন্দ্রে ব্লকভিত্তিক একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রঞ্জিতকুমার মাইতি এবং সভাপতিত্ব করেন বাখড়া শ্যামাস্মৃতি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক গোবিন্দচন্দ্র তরাই। 'মহাকাশ ও মানবজাতি' বিষয়ক প্রতিযোগিতা-মূলক আলোচনাচক্রে প্রথম স্থান অধিকার করে বাসিন্দা এস. সি হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র লক্ষ্মীরাম মুর্মু। পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রীতরাই, বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন উদ্বোধক শ্রীমাইতি, এবং যুবকরণ আধিকারিক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

রাণাঘাট বিজ্ঞান সমিতি

গত 19 সেপ্টেম্বর রাণাঘাট পি সি স্কুলে সমিতির উদ্যোগে একটি বিজ্ঞান আলোচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনার বিষয় ছিল 'হিরোসিমা-নাগাসাকি আর নয়'। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে যথাক্রমে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সজল দত্ত, অমিতাভ দত্ত ও গোপীন অধিকারী।

দ্বিতীয় ভারতীয় কুমেরু অভিযান

গত পয়লা ডিসেম্বর গোয়ার মারমাগাঁও বন্দর থেকে দ্বিতীয় ভারতীয় অভিযাত্রী দল 'এম ডি পোলার সারকল' জাহাজ যোগে দক্ষিণ মেরু অভিমুখে যাত্রা করেছেন। 28 জন সদস্য বিশিষ্ট এই দলের নেতৃত্ব করছেন ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষার অধিকর্তা ভি ইউ রাইনা। ভারতের 12টি বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে এই অভিযানের সদস্যরা এসেছেন। এ ছাড়া সেনা, নৌ এবং বিমান-বাহিনী থেকে পাইলট, ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারদের নেওয়া হয়েছে। এই দলে একজন বিশেষজ্ঞ ফটোগ্রাফারও আছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গত বছর জানুয়ারি মাসে প্রথম ভারতীয় অভিযাত্রী দল দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে 10 দিন গবেষণা পরিচালন করেছিলেন।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

2য় বর্ষ 10ম সংখ্যা ॥ 1983
জানুয়ারী সংখ্যা
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি, তোমরা সকলেই ভালোভাবে পাস করে পরবর্তী উঁচু ক্লাশে উঠেছ, আর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তারাও টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার গণিত বিষয়ে সম্পাদ্যের চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে সতর্কতার নির্দেশ এবং জীবনবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো। ভৌত বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী আগামী সংখ্যায় পাবে। তোমাদের অনেকের অনুরোধ মতো 'শরীর, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা' নামে একটি নতুন বিভাগ এই সংখ্যা থেকে শুরু করা হলো।

'পরিচিত পাখী' বিষয়ে আমরা যে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম তাতে প্রথম তিনজন স্থানাধিকারীর লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখাগুলি তোমাদের ভালো লাগবে নিশ্চয়।

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 1
বিজ্ঞান-সংবাদ 2
সম্পাদকীয় 3
দপ্তর থেকে
সূর্য কি যুগল নক্ষত্র ? ॥ সমরজিৎ কর 4
গল্প
প্রফেসর ব্রহ্ম ও কালো চিতা ॥ সুধীন্দ্র সরকার 9
পড়াশোনা
সম্পাদ্যের চিত্র অঙ্কনে সতর্ক হওয়া উচিত ॥ অসীম মুখোপাধ্যায় 17
জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ॥ তারকমোহন দাস 25
জীবনবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ॥ দিনোজকুমার দে 28
লঘুতম গ্যাস : হাইড্রোজেন ॥ অমরনাথ রায় 30
শব্দ ॥ অলক চক্রবর্তী 37
উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 33
পশুপাখীর গল্প
প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর সন্ধানে ॥ চিত্তরঞ্জন রায় 20
ছবিতে গল্প
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 40
ছবির মজা ॥ প্রণব হোড় 16
জুলেভার্নের টোয়েণ্টী থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার : প্রচ্ছদ 2, 3
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
এবারের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ॥ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 6
জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
বলয়ের রাজা শনিগ্রহ ॥ বিমান বসু 41
মহাদেশ ও মহাসাগরের জন্ম ॥ স্বপন মুখোপাধ্যায় 14
শীতের ভয় ॥ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 22
ইলেক্ট্রিক্যাল নয়েজ হয় কেন ॥ সাখাওয়াৎ ওসমান 23
যুক্তি বুদ্ধির খেলা
খেলার নাম গোলক ধাঁধা ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ 46
ডিসেম্বরের খেলা L-এর সম্বন্ধে ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ 47
আবিষ্কারের গল্প
সেফটি ল্যাম্প আবিষ্কারের নেপথ্যে ॥ চৈতালী ঘোষ 55
ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম 49
প্রশ্নোত্তর 50 বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা 50
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর 50
পরিচিত পাখি ॥ রাকা সাহা 52 পীযুষ চক্রবর্তী 52 শান্তিময় রায় 53
নিজে কর
তরঙ্গের ব্যতিচার ॥ মনোজ পিল্লাই ও সুজয় ঘোষ 51
কী করে জীরক্স হয় ॥ সৌমেন চক্রবর্তী 54

দপ্তর থেকে

সূর্য কি যুগল নক্ষত্র?

সমরজিৎ কর

আমরা যে নক্ষত্রজগতে বাস করি তার নাম 'ছায়াপথ'। ইংরেজিতে বলা হয় Milky Way Galaxy। এর ব্যাস 1 লক্ষ আলোক বৎসর; বেধ 20 হাজার আলোক বৎসর। তোমরা জানো হয়তো, আলো 1 সেকেণ্ডে ভ্রমণ করে 186000 মাইল। এই গতিতে আলো 1 বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকেই বলা হয় 1 আলোক বৎসর। তা হলে বুঝতেই পারছ, কত বড় আমাদের এই নক্ষত্র জগৎ? কোটি কোটি নক্ষত্রের বাস এই নক্ষত্রজগতে, যাদের মোট ভর আমাদের সূর্যের ভরের প্রায় 10000 কোটি গুণ। সূর্য এই নক্ষত্রজগতের কেন্দ্র থেকে প্রায় 30000 আলোক বৎসর দূরে অবস্থান করছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, বেশ কিছু সংখ্যক খুদে খুদে নক্ষত্র আমাদের এই 'ছায়াপথ'-এ বিচরণ করছে, যাদের ভর আমাদের সূর্যের ভরের প্রায় তিরিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। দীর্ঘকাল জ্বলার পর এরা এখন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। এখন এইসব নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে আসছে শুধু 'ইনফ্রা রেড' বা অবলোহিত রশ্মির ক্ষীণ বিকিরণ। এদের তাপমাত্রা কমছে। সেই সঙ্গে নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণে দ্রুত সঙ্কুচিত হচ্ছে।

এই নক্ষত্রগুলি সম্পর্কেই বছর কয়েক আগে অদ্ভুত একটি মন্তব্য করেছিলেন মার্কিন দেশের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্রিস ডেভিডসন। তাঁর ধারণা, আমাদের সূর্য হয়তো একটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র নয়। এক বা একাধিক খুদে নক্ষত্র সূর্যের সহচর হিসেবে বিরাজ করছে। তবে সৌরমণ্ডলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তেমন একটা জোরালো নয়, বরং শিথিল। ডেভিডসন বলেছেন, সূর্যের এই সহচর নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের একশ' ভাগের এক ভাগ। এমন কি বৃহস্পতি গ্রহের ভরের মতও হতে পারে। অর্থাৎ সূর্যের ভরের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল। সূর্য থেকে ওই সহচর নক্ষত্রগুলির দূরত্ব 6510 কোটি থেকে 9300 কোটি মাইল।

কিছু কিছু যুগল নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। যাদের পারস্পরিক দূরত্ব কতকটা এইরকম। এ থেকে মনে হয়, ডেভিডসন হয়তো এটাই বলতে চান —আমাদের সূর্যও যুগল নক্ষত্র।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দুই, তিন অথবা একাধিক নক্ষত্র পরস্পর সহচর হিসেবে বিচরণ করছে। দুটি নক্ষত্র যখন সহচর হয় তখন তাদের বলা হয় 'যুগ্ম বা যুগল নক্ষত্র। ইংরেজিতে বলা Binary Stars। দুই-এর বেশি হলে বলা হয় 'বহুসঙ্গ' নক্ষত্র বা Multiple Stars। একক নক্ষত্র তার নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের চার পাশে আবর্তন করে। কিন্তু যুগল নক্ষত্রের বেলায় ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরকম।

যুগল নক্ষত্রের কথাই ধরা যাক। মনে কর, দুটি নক্ষত্র। তারা আয়তনে সমান হতে পারে, অথবা ছোট বড়ও হতে পারে। এবার একটি কল্পিত রেখা টেনে দুটি নক্ষত্রকে যোগ কর। তা হলে ব্যাপারটা যেন দাঁড়ালো একটি ডামবেলের মত। ওই রেখার নির্দিষ্ট একটি জায়গায় থাকবে উভয় নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র। এবার ওই কেন্দ্রের চারপাশে ডামবেলটি ঘোরালে অবস্থাটি যেমন দাঁড়ায়, যুগল নক্ষত্রের আবর্তনও দাঁড়াবে সেইরকম। তখন মনে হবে, যখন একটি নক্ষত্র দর্শকের সামনে এগিয়ে আসছে, অপরটি তখন দূরে সরে যাচ্ছে। আবার অপরটি যখন সামনে এগিয়ে আসছে, প্রথমটি দূরে সরে যাচ্ছে। এইভাবে একটির সামনের দিকে এগিয়ে আসা এবং অপরটির দূরে সরে যাওয়া একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর চলে। যখন তিন অথবা তারও বেশি সংখ্যক নক্ষত্র সহচর হিসেবে নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ বিন্দুর চারপাশে আবর্তন করে তখন তারা একে একে পর্যায়ক্রমে কখনও একইভাবে সামনের দিকে এগিয়ে আসে, কখনও দূরে সরে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, ব্রহ্মাণ্ডের 30 থেকে 50 ভাগ নক্ষত্রই 'যুগল' অথবা 'বহুসঙ্গ'।

যুগল নক্ষত্রদের শ্রেণীবিভাগও করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। যেমন ধর, এক শ্রেণীর যুগল নক্ষত্রদের বলা হয় 'দৃশ্যমান যুগল', ইংরেজিতে ভিসুওয়াল বাইনারিজ।' এদের দূরবীনের সাহায্যে সরাসরি বোঝা যায়। এধরনের এক একটি যুগল নক্ষত্রের পারস্পরিক দূরত্ব 279 কোটি থেকে 465 কোটি মাইল। এক একটি নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ বিন্দুকে কেন্দ্র করে এরা উপবৃত্তীয় পথে বিচরণ করে। এ পর্যন্ত এই ধরনের 60,000 নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যুগল নক্ষত্রদের বলা হয় 'বর্ণালীয় যুগল', ইংরেজিতে 'সেপকট্রোস্কোপিক

বাইনারিজ'। এ ধরনের যুগল নক্ষত্রের পারস্পরিক দূরত্ব অনেক কম। তাই দূরবীনের সাহায্যে সরাসরি পৃথক অবস্থায় খালি চোখে ধরা পড়ে না। বর্ণালী পরীক্ষা করেই এ ধরনের 'যুগল' চিনতে হয়। ব্যাপারটা দাঁড়ায় তখন এইরকম। দুটি নক্ষত্র পরস্পর আবর্তন করার সময় তাদের মধ্যে যেটি পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে সেটিকে ক্রমে উজ্জ্বলতর মনে হয়; দ্বিতীয়টি দূরে সরতে থাকে বলে মনে হয় ক্রমে সেটি যেন নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। তাদের আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে তবেই বোঝা যায় তাদের অস্তিত্ব। এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর 'যুগল' আছে, যাদের বলা হয় 'আলোকমিতিক যুগল', ইংরেজিতে 'ফটোমেট্রিক বাইনারিজ'। কখনও কখনও এদের 'গ্রাহণিক নক্ষত্র' বা 'ইকলিপসিং ভেরিয়েবল'-ও বলা হয়। এদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এইরকম ঃ ধর, কাছাকাছি দুটি নক্ষত্র। তারা যুগল। একই মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের চারপাশে আবর্তন করছে। তাদের পরিক্রমণ পথও একই সমতলের উপর। তখন অবস্থাটা দাঁড়ায় কেমন জানো? ওদের মধ্যে একটি নক্ষত্র যখন আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, অপর নক্ষত্রটি পড়ে যায় তার আড়ালে। আবার অপরটি যখন সামনে আসে প্রথমটি তার আড়ালে পড়ে। উভয় নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য পৃথক হয়। আর তা দেখেই বোঝা যায় তারা 'যুগল'।

অবশ্য আরও এক শ্রেণীর যুগলের কথাও বলে থাকেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এদের বলা হয় 'জ্যোতির্মিতীয় যুগল', ইংরেজিতে 'অ্যাসট্রোমেট্রিক বাইনারিজ'। কোন কোন নক্ষত্রের গতিপথ নির্ণয় করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, তাদের যে পথ ধরে সচরাচর বিচরণ করার কথা, মাঝে মাঝে সেই পথ থেকে তারা যেন দূরে সরে যায়। যেমন, সৌরমণ্ডলে কোন গ্রহ অপর গ্রহের কাছাকাছি এলে তাদের পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণে সেই গ্রহের গতিপথ কিছুটা পাল্টায়—ব্যাপারটা কতকটা সেইরকম। মনে হয় অপর কোন নক্ষত্র যেন টেনে ধরে ওই নক্ষত্রটির গতিপথ পাল্টাচ্ছে। পরে জানা গেছে, সত্যিই তাই হয়! পরস্পরের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে, তেমন যুগলদেরই বলা হয় 'জ্যোতির্মিতীয় যুগল।'

যাই হোক, এবার সূর্যের কথায় আসি? হ্যাঁ, ডেভিডসন বলছেন, সূর্যেরও একটি সহচর আছে। অদৃশ্য সহচর। তিনি তার নাম রেখেছেন 'লুসিফার'। লাতিন এই শব্দটির অর্থ 'আলোক আনয়নকারী'। না, পরীক্ষা করে এটির অস্তিত্ব এখনও ধরা যায় নি। তবে কয়েকটি ঘটনা দেখে মনে হয়, সূর্যের সহচর থাকাটা হয়তো অসম্ভব নয়।

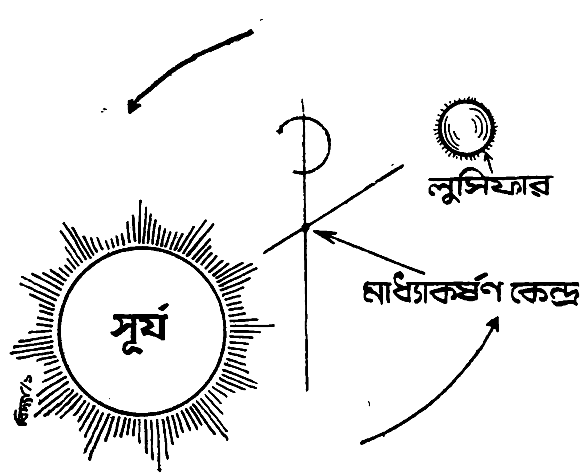

ডেভিডসন বলছেন, ধূমকেতুর কথাই ধরা যাক না। আমরা জানি কোন কোন ধূমকেতু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার পর সৌরমণ্ডলের বাইরে চলে যায়। অতএব একটা প্রশ্ন তো উঠতেই পারে? একবার সৌরমণ্ডলের বাইরে গেলে সূর্য সেই ধূমকেতুকে আবার কিভাবে আকর্ষণ করে টেনে আনে? তবে হ্যাঁ, যদি ধরা যায়, লুসিফারের মত তার একটি সঙ্গী আছে তা হলে অবশ্য তা সম্ভব। লুসিফারই আবার সেই ধূমকেতুকে সূর্যের দিকে টেনে দেয়।

আরও একটি ব্যাপার। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, ধূমকেতু সূর্যের কাছে এলে তার উত্তাপে ধূমকেতুর কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়। তার ভর কমে। মজার ব্যাপার এই, যতই কমুক, কমার পরও তো তার একটি নির্দিষ্ট ভর থাকে? কিন্তু দেখা গেছে, কোন ধূমকেতু সূর্যের কাছে ঘুরে যখন সৌরমণ্ডলের বাইরে চলে যায় এবং আবার তারপর ফিরে আসে, তার ভর খানিকটা কমে যায়। এর কারণ হয়তো এই, ওই ধূমকেতু লুসিফারের কাছে গেলে সেখানে তার কিছুটা ভর বাষ্পীভূত হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন পড়ে সূর্যের কাছে এলে। ধূমকেতুর এই ভর কমার ব্যাপারটা দেখে কেউ কেউ মনে করছেন, সূর্যের নিশ্চয় একটি সঙ্গী নক্ষত্র রয়েছে। ভবিষ্যতে মহাকাশযান থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিজ্ঞানীরা হয়তো তাকে খুঁজে পেতেও পারেন।

এবারের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যায় এবার মোট পাঁচজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তার মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে এককভাবে দুজন বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে যৌথভাবে তিনজন বিজ্ঞানী এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তাঁদের কর্ম-কৃতিরপরিচয় এবং কি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে তাঁরা এই অনন্য সম্মাননা লাভ করেছেন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

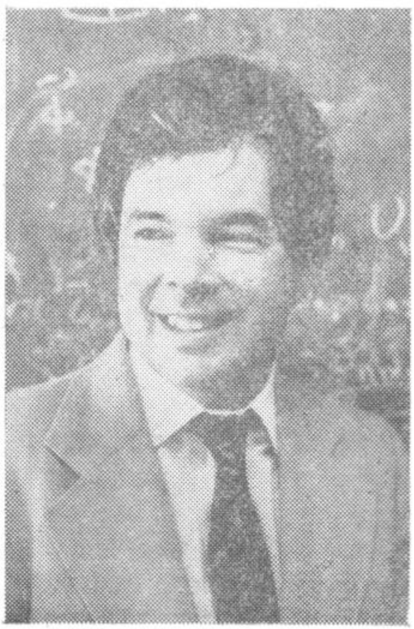

কেনেথ জি উইলসন

পদার্থবিজ্ঞান

কয়েক বছর ধরে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে যৌথভাবে একাধিক বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছিল। এ বছর কিন্তু এককভাবে একজন বিজ্ঞানীকে পদার্থবিজ্ঞানে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক কেনেথ জি উইলসন।

অধ্যাপক উইলসনের বর্তমান বয়স 46 বছর। 1936 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটের অন্তর্গত ওয়ালথামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 1961 সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজি থেকে ডকটরেট ডিগ্রী লাভ করেন। 1971 সাল থেকে তিনি করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

পদার্থবিজ্ঞানে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে সুইডেনের রয়েল বিজ্ঞান আকাদেমি অধ্যাপক উইলসনকে নোবেল পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত করেছেন সেটি হচ্ছে 'অবস্থান্তর সম্পর্কিত সন্ধি ঘটনা' (ক্রিটিক্যাল ফেনোমেনা ইন কানেকশান উইথ ফেজ ট্রানজিসন্স্)। কিভাবে বস্তুর অবস্থান্তর ঘটে তার একটা সম্পূর্ণ চিত্র উইলসন তাঁর এই তত্ত্বে রূপায়িত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাপ বা চৌম্বকত্বের প্রভাবে কঠিন বরফ কিভাবে তরল জলে বা বায়বীয় জলীয় বাষ্পে রূপান্তরিত হয় তার গাণিতিক সূত্র উইলসন দিয়েছেন। এর ফলে বিজ্ঞানীরা এই অবস্থান্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে পারবেন। এর আগে যেসব তত্ত্বের দ্বারা এই সব অবস্থান্তর ব্যাখ্যা করা হত, সেগুলি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যথাযথভাবে মেলে না।

কেনেথ উইলসম 1971 সালে প্রকাশিত দুটি গবেষণাপত্রে এই সমস্যাটি সুনির্দিষ্ট ও সুসংহতভাবে সমাধান করেছেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উইলসনের গবেষণার ফল আশু প্রয়োগের সম্ভাবনা নেই। তবে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বস্তুর অবস্থান্তর ব্যাখ্যার জন্যে পদার্থবিজ্ঞানীরা যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হন, তার সদুত্তর উইলসনের তত্ত্বে পাওয়া গেছে। তাঁর এই গবেষণা 'কোয়ার্কের অবরোধ' (কোয়ার্ক কনফাইনমেণ্ট) পর্যালোচনায় বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে সহায়তা করবে। আমরা জানি, কোয়ার্ক হচ্ছে পরমাণুগঠনের মৌল কণা।

বিভিন্ন বস্তু কিভাবে গঠিত হয় তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে বস্তুর অবস্থান্তর সম্পর্কে উইলসনের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে বস্তুর গঠন-বিন্যাসের গভীরে প্রবেশের চাবিকাঠি তাঁদের হাতে তুলে দেবে।

রসায়ন

রসায়নশাস্ত্রে এ বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল রিসার্চ কাউন-সিল গবেষণাগারের অধ্যাপক অ্যারন ক্লাগকে। তিনি সেখানে মলিকুলার বায়োলজি বা আণবিক জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ক্লাগের বর্তমান বয়স 56 বছর। 1926 সালে তিনি লুথিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। 1949 সালে তিনি ব্রিটেনে আসেন এবং বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগারে কাজ করেন। এর পর তিনি লণ্ডনের বারবেক কলেজে এবং কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। 1962 সালে তিনি কেম-ব্রিজের পিটারহাউস কলেজের ফেলো এবং সাত বছর পরে অর্থাৎ 1969 সালে ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মানোন্নয়ন এবং ক্রোমোজোমের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বিশেষ অবদানের জন্যে অধ্যাপক ক্লাগকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। তিনি এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণযন্ত্রে দ্বিমাত্রিক প্রতিচ্ছবির পরিবর্তে ত্রি-মাত্রিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আমরা জানি, ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেকট্রন প্রবাহের সাহায্যে সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে বহু গুণ বিবর্ধিত করে দেহকোষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা যায় এবং তার ফলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। ক্লাগ তাঁর পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনসমূহের গঠন-শৈলী পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এইভাবে 'ক্রোমাটিন'-এর গঠনবিন্যাস পর্যালোচনা করেছেন। আমরা জানি, ক্রোমাটিন হচ্ছে এক জাতীয় প্রোটিন, যা দেহকোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে থাকে এবং বংশানুক্রমের (জিন) তথ্য বা সংকেত বহন করে।

ক্লাগ একটি গাণিতিক সূত্র উদ্ভাবন করেছেন, যার ফলে ক্রিস্টালোগ্রাফিক ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মান উন্নত করা গেছে। তাঁর এই গাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণে প্রভূত সুবিধা হয়েছে।

শরীরবৃত্ত ও চিকিৎসাবিজ্ঞান

এ বছর শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসাবিজ্ঞান শাখায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যৌথভাবে তিনজন বিজ্ঞানীকে। তাঁরা হলেন স্টকহোমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিট্যুটের ডঃ সুন বার্গস্ট্রম ও ডঃ বেংট স্যামুয়েলসন এবং ইংল্যাণ্ডের বেকেনহাম-এন ওয়েলকাম গবেষণাগারের ডঃ জন ভেন। বার্গস্ট্রমের জন্ম 1916 সালে স্টকহোম শহরে, স্যামুয়েলসনের জন্ম হয় 1934 সালে হ্যামস্টেডে আর ভেনের জন্ম ইংল্যাণ্ডের উরউস্টারশায়ারে 1927 সালে।

'প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন' নামে এক নতুন ধরনের ওষুধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে এই তিনজন বিজ্ঞানীকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। জটিল দেহতন্ত্রের মধ্যে প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন কিভাবে কাজ করে তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এঁরা।

'প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন' নিয়ে গবেষণা বহুকাল আগেই শুরু হয়। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রকাশ পায়, প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন হচ্ছে 'প্রস্টেট' গ্রন্থি নিঃসৃত একরকম হরমোন। 1930 সাল নাগাদ ভন ইউলার নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী গবেষণা করেন প্রস্টেট বা তার আশেপাশের গ্রন্থিগুলিতে কি এমন পদার্থ আছে, যার দরুন শরীরের মধ্যে নানারকম পরিবর্তন ঘটে। পাঁচ বছরের নিরলস গবেষণার পর তিনি আবিষ্কার করলেন, প্রস্টেট গ্রন্থির নির্যাসে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে যার প্রভাবে এইসব পরিবর্তন হয়ে থাকে। প্রস্টেটগ্রন্থি নিঃসৃত এই রাসায়নিক পদার্থ-

(বাঁ দিক থেকে)—জন ভেন, সুন বার্গস্ট্রম এবং বেংট স্যামুয়েলসন

গুলির তিনি সম্মিলিতভাবে নাম দিলেন 'প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিনস'।

এরপর ষাট দশকের গোড়ায় স্টকহোমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিট্যুটে ডঃ বাগস্টম, ডঃ স্যামুয়েলসেন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ভেড়ার সেমিনাল ও প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে দু ধরনের প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন আলাদা করতে সমর্থ হলেন। তাঁরা এদের নাম দিলেন—'প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন-E' এবং 'প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন-F'। এর তিন বছর পরে অর্থাৎ 1963 সালে ডঃ লী নামে আর একজন বিজ্ঞানী খরগোসের কিডনি বা বৃক্ক থেকে তৃতীয় ধরনের 'প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন-A' আলাদা করলেন। পরবর্তীকালের গবেষণায় জানা গেল, শুধুমাত্র প্রস্টেট বা সেমিনাল গ্রন্থিতেই নয়, শরীরের প্রায় সব 'টিস্যু'তেই কোনো না কোনো ধরনের প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন পাওয়া যায়। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপজন গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন প্রস্তুত করতে সমর্থ হলেন। এদিকে ইংল্যাণ্ডে ডঃ ভেন রক্তে প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন পরিমাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন, 'আসপিরিন' জাতীয় ওষুধ যা ব্যথা উপশম করে বা জ্বর কমায়, তাদের কার্যকলাপ হচ্ছে প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিনগুলির সৃষ্টি রোধ করা।

ইতিমধ্যে জানা গেছে, প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন যেমন যন্ত্রণা উপশম করে, তেমনি আবার যন্ত্রণা সৃষ্টিও করে। বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিজ্ঞানীরা প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন প্রয়োগ করে আশাতীত সুফল পেয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে হাঁপানি, গেঁটে বাত, পাকস্থলীর ক্ষত, মূত্রাশয়ের পাথুরী, উচ্চ রক্তচাপ, রক্ত জমাট বাঁধার নানা রোগে, এমন কি প্রসববেদনা শুরু করাতেও প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন বিশেষ ফলপ্রদ। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে—একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

স্নেহনিকেতন, 22 টেগোর ক্যাসল স্ট্রীট, কলি-6

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়

প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় 95 বছর বয়সে গত 11 ডিসেম্বর 82 পরলোক গমন করেছেন। প্রিয়দারঞ্জন ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং তাঁর জীবনধারা গুরুর মতোই ছিল সরল অনাড়ম্বর। এম

এ পরীক্ষায় (তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এস-সি পাঠক্রম চালু হয় নি) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হবার পর প্রিয়দারঞ্জন সিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। তারপর সার আশুতোষের আহ্বানে নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকপদে তিনি যোগদান করেন এবং সেই বিভাগের প্রধানরূপে 1952 সালে অবসর গ্রহণ করেন।

গুরুর নির্দেশে প্রিয়দারঞ্জন ডক্টরেট ডিগ্রির জন্যে গবেষণা-পত্র পেশ করেন নি এবং উচ্চতর গবেষণার জন্যে বিদেশেও যান নি। পরবর্তীকালে অবশ্য ঘোষ ভ্রমণ বৃত্তি লাভ করে পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে তিনি সুইজারল্যাণ্ড ও অস্টিয়ায় দুটি বিশিষ্ট গবেষণাগারে কিছুকাল গবেষণা করেন। তাঁর জীবন সায়াহ্নে যাদবপুর, বর্ধমান ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করেন।

অজৈব রসায়নে প্রিয়দারঞ্জন ছিলেন অন্যতম দিকপাল এবং এই বিষয়ে তাঁর উচ্চমানের গবেষণা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ করে। 1932 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি সমিতির সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান রাসায়নিক সমিতির সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সংস্থার অধিকর্তা এবং আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এবং বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রিয়দারঞ্জন শুধু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন না, বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ লেখকও ছিলেন। তাঁর রচিত 'বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ', 'রসায়ন ও সভ্যতা' 'অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী', 'বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম' গ্রন্থগুলি পাঠকসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রগাঢ় অনুরাগী ঋষিপ্রতিম উদার-হৃদয় এই চিরকুমার মানুষটি কিশোরদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাদের জন্যে নানা পত্রপত্রিকায় লেখনীও ধারণ করেছিলেন। আমরা তাঁর পুণ্য স্মৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

প্রফেসর ব্রহ্ম ও কালোচিপ

সুধীন্দ্র সরকার

ব্যাপারটা যে শেষপর্যন্ত এতদূর গড়াবে প্রফেসর ব্রহ্ম তা ভাবতেই পারেন নি। দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল আজ সমূলে ধ্বংস হলো। সাধের ল্যাবরেটরি আজ ধূলিসাৎ। 'লাইফ এনলার্জার' থেকে শুরু করে রিসার্চ পেপারগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। ল্যাবরেটরির মেঝে জুড়ে কাচের ছড়াছড়ি। ফ্লাস্ক, টিউব, কমপিউটার সব ভেঙ্গে ফুটিফাটা। নিজের সৃষ্টি যে এইভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, ভাবাই যায় না! ঝিম মেরে বসেছিলেন ব্রহ্ম। বারবার ওঁর মনে পড়ছিল কালকে রাতের ঘটনাগুলো। যখনই চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সেই বীভৎস দৃশ্য—চোখ যেন আপনিই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

গাঁয়ের ডাকসাইটে চোর হারু মণ্ডল। তবে ছিঁচকে চুরিটুরি ওর একদম পছন্দ নয়। যখনই চুরি করতে বেরোয় মোটা দাঁও মেরে ঘরে ফেরে। চৌকিদার থেকে শুরু করে গাঁয়ের দারোগাবাবু পর্যন্ত ওকে চেনে। জানে ও চুরি করে। তবু বমাল সমেত ধরা পড়েনি বলে হাজতে ঢোকানো যায় নি।

যে রাতে ও চুরি করতে বেরোয়, সে রাতে আর ঘরে ফেরে না। ফেরে পরের দিন বিকেলে। এই সময়টুকুর মধ্যে চোরাইমাল শহরে বিক্রি করে, পছন্দসই অন্য জিনিস কিনে আনে। সঙ্গে থাকে ক্যাশমেমো, তাই ওকে ধরে কার সাধ্য। এমনি করে মেজাজে দিন কেটে যায় হারুর।

গাঁয়ের সীমানার শেষে বিরাট জঙ্গল। জঙ্গলে সাপখোপ তো আছেই, এমন কী মাঝে মধ্যে বাঘটাগেরও

হাঁক শোনা যায়। তবে বাছাধনরা গাঁয়ে কোন দিন হামলা করে নি। নিজের জঙ্গলের রাজত্ব নিয়েই ওরা ব্যস্ত।

হারু ভেবে পায় না, প্রফেসর ব্রহ্ম ওই জঙ্গলের গা ঘেঁষে কেন বাড়ি করলেন। গাঁয়ের শেষ সীমানায় ওই নির্জন লোকালয়ে প্রফেসর ব্রহ্মের বাড়িতে ওর চুরি করার অনেক দিনের সাধ।

প্রফেসর নিশ্চয়ই কোন বদ মতলবে ওখানে থাকেন। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চোরাগোপ্তা পথে বিদেশী মালটালের ব্যবসা করেন সকলের চোখের আড়ালে। জঙ্গল শেষ হলেই তো বাংলাদেশের সীমানা। কাজেই অসাধু ব্যবসার সুযোগ অঢেল।

হারু ভাবে, চোরের ওপর বাটপাড়ি করার মজা অনেক বেশি। প্রফেসরের ঘরে নিশ্চয়ই দামী মালপত্তর আছে। একবার ঢুকতে পারলে মোটা টাকা। তারপর না হয় গা ঢাকা দিয়ে কিছুদিন লুকিয়ে থাকবে জঙ্গলে।

নিঃঝুম রাত।

বৃষ্টি পড়ছিল টিপ টিপ করে। হারু চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। সারা গাঁ এখন নিশ্চুপ। সবাই যে যার ঘরে। কাজেই কেউ দেখতে পেল না ওকে।

নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে হারু। মেঠো পথ বৃষ্টির জলে প্যাচ্‌পেচে। ও পা ফেলে সাবধানে। দূরে একটা কুকুর ওকে লক্ষ্য করে তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো। সামনের বাঁশঝাড়টা পেরোতে পারলেই প্রফেসর ব্রহ্মের বাড়ি। হন হন করে হাঁটতে শুরু করলো হারু।

প্রফেসর ব্রহ্ম টেবিলল্যাম্পের আলোতে কী সব লিখছিলেন। গাঁয়ে যে কটা বাড়িতে বিজলি বাতি জ্বলে এই বাড়িটা তার মধ্যে একটা। হারু টুপ করে পাঁচিল টপ্‌কালো। না, কোন কুকুরটুকুর নেই। নিশ্চিত হলো ও। তবে বাড়ির মালিক যে একটা আস্ত বোকা সে সম্বন্ধে হারু নিশ্চিত। নইলে গেঁয়ো বাড়িতে বিজলি বাতি জ্বালাতে পারে, আর একটা পাহারাদার রাখতে পারে না? এমন খাঁ খাঁ জায়গায় বাড়ি। যাক গে, এতে তো ওরই সুবিধে হলো বেশি। হাত না চালিয়ে বিনা বাধায় পৌঁছে গেল উঠোনে।

উঠোনে পা রেখেই নাক সিঁটকালো হারু। গোটা বাড়িতে কেমন যেন চিড়িয়াখানা চিড়িয়াখানা গন্ধ। গাটা রি রি করে ওর। ঘুরে ঘুরে দেখলো বাড়িটা তিনটে মাত্র ঘর। ঘরে যেমন কোন তালা নেই, তেমন কোন লোকজনও নেই। ব্যাপারটা কী? প্রফেসর ছাড়া বাড়িতে কী দ্বিতীয় কোন প্রাণী থাকে না? উঠোনটা ছাড়া সব ঘরগুলোই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কেবলমাত্র যে ঘরে প্রফেসর কী সব লিখছিলেন সেই ঘরেই যা আলো জ্বলছিল।

প্রথম ঘরে ঢুকতেই চিড়িয়াখানার গন্ধ আরো তীব্র হলো। ভয় পেয়ে গেল হারু। দ্রুত বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। কী জানি কোন জন্তুটন্তু কামড়ে দেয় যদি। দ্বিতীয় ঘরটাতে ঢুকে দেশলাই জ্বালালো। নজরে পড়লো একটা তক্তপোষ আর জলের কুঁজো। উটকে পাটকে খুঁজলো সব। চুরি করার মতো কোন জিনিস ওর চোখে পড়লো না।

মনে মনে বিরক্ত হলো হারু। রাতটা মাঠেই মারা যাবে নাকি? তৃতীয় ঘরে উঁকি মারতেই চোখ ছানাবড়া। ঘরের চারদিকে বিভিন্ন আকারের কাঁচের জার, টিউব আরো নানারকমের আবোলতাবোল জিনিস। চুরিটা করবে কী? ঘরের মধ্যিখানে একটা বড় টেবিলের ওপর আজব একটা যন্ত্র। হাত চারেক লম্বা, আর হাত দুয়েক উঁচু একটা কাচের বাক্স। বাক্সের ভেতরে নিচের দিকে বিভিন্ন আকারের খোপ। অনেকগুলো ইলেকট্রিক তার সেই বাক্সের বিভিন্ন দিকে লাগানো। বড় কাচের বাক্সের ওপর দিকে আর একটা চৌকো মত ছোট বাক্স। ছোট বাক্সটার গায়ে ছোট বড় গোল চাকতি বসানো। যে চাকতিগুলো বিভিন্ন দিকে ঘোরানো যায়। একটা ঘষা কাচ ছোট বাক্সর গায়ে লাগানো। ছোট বাক্সটা দেখতে অনেকটা টি ভির মতো।

কাগজকলম ছেড়ে প্রফেসর ব্রহ্ম উঠে দাঁড়ালেন। যন্ত্রটার কাছে এসে গোল চাকতি অর্থাৎ নবগুলো আঙুল দিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। দপ্‌ দপ্‌ করে ছোট বাক্সটার গায়ে বিভিন্ন রঙের আলোর ফুটকি জ্বলে উঠলো।

প্রফেসর টেবিলে রাখা একটা কাচের পাত্র থেকে চিমটে করে কী একটা তুলে নিয়ে বড় কাচের বাক্সের একটা খোপে রাখলেন। তারপর ছোট বাক্সর গায়ে একটা বড় নব ঘোরাতেই সবুজ আলোয় ভরে গেল ঘরটা। সবুজ রঙের তীব্র আলোটা বেরোচ্ছিল বড় কাচের বাক্স থেকে। বড় কাচের বাক্সটা আর দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল একখণ্ড সবুজ উজ্জ্বল স্ফটিকখণ্ড টেবিলে রাখা আছে।

চোখে একটা রঙিন চশমা পরে প্রফেসর ছোট বাক্সর গায়ে একটা সুইচ অন করতেই ঘষা কাচে একটা ছবি ফুটে উঠলো। ভালো করে দেখলো হারু। গা ঘিন ঘিন করে উঠলো ওর। ঘষা কাচে একটা কেঁচোর ছবি। কেঁচোটা কিল্‌বিল্‌ করছে।

প্রফেসর বিড় বিড় করে কী যেন বকছেন, আর টেবিলে রাখা একটা ছোট ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো হারুর। সবুজ আলোটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখ দিয়ে

ঝরঝর করে জল পড়তে শুরু করেছিল ওর। চোখ দুটো রগড়ে নিল জোরে।

ঘষা কাচে এখন কেঁচোর বদলে একটা মোটা সাপ *কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।*

সাপের ছবিটা দেখেই লাফিয়ে উঠলেন প্রফেসর। ঘরের মধ্যে শুরু করলেন উদ্দাম নৃত্য। প্রফেসর মুখে ফরফর ইংরেজি বলছেন, আর নাচছেন আপন খেয়ালে।

হারুর মনে হলো, কানের পাশে একটা সাপ বুঝি ফোঁস ফোঁস করছে। প্রফেসর একটা সুইচ টিপতেই সব অন্ধকার। হারু সম্মোহিতের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছিল ব্যাপারস্যাপার। চুরি করার কথা তখন বেমালুম ভুলেই গেছে। ঠিক তক্ষুণি ওকে চমকে দিয়ে কে যেন কলার ধরলো। কঁক্ করে ককিয়ে উঠলো হারু।

প্রফেসর ব্রহ্ম ঘরে নিয়ে এলেন ওকে। ঘামে ওর সারা গা ভিজে সপ্‌সপে।

গম্ভীর গলায় প্রফেসর বললেন ঃ 'লুকিয়ে দেখছিলে কেন? ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই তো দেখতে পারতে।' একটা চুরুট ধরালেন প্রফেসর, 'কী নাম তোমার?'

'হা-হারু মণ্ডল।' তোতলাতে তোতলাতে হারু বললো।

'হারু! নামটা শোনা শোনা। তুমিই কী সেই মূর্তিমান? তা আমার বাড়িতে কী মতলবে। চুরি করতে?'

'না, না।'

'উঁহু। সত্যি কথা বল। কোন ভয় নেই তোমার।'

'চুরি করতেই এসেছিলাম বাবু। কিন্তু বিশ্বাস করুন কিচ্ছু চুরি করি নি। অবাক হয়ে দেখছিলাম আপনার কাজ।'

'অবাক হয়ে দেখছিলে?' হো হো হেসে উঠলেন প্রফেসর ব্রহ্ম, 'দেখে কিছু বুঝলে?'

হারু উত্তর দিল না। দাঁড়িয়ে রইলো মাথা নিচু করে।

প্রফেসর চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন ঃ 'আজকের রাতটা আমার কাছে খুব স্মরণীয়, বুঝলে হারু। দীর্ঘ ন'বছরের একটানা গবেষণা আজ আমার সার্থক।' প্রফেসর ব্রহ্ম হারুর কাঁধে হাত দিয়ে যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেলেন, 'এই যন্ত্রের নাম লাইফ এনলার্জার। এর কাজ হচ্ছে কোন প্রাণীকে তার আকারের বৈশিষ্ট্য সঠিক বজায় রেখে চেহারার আয়তন বৃদ্ধি করা। আজ প্রথম এক্সপেরিমেণ্ট করলাম একটা কেঁচোকে দিয়ে। কেঁচো আর সাপের আকার একই। এই যন্ত্রের সাহায্যে কেঁচোর শরীরের কোষের সংখ্যা বাড়িয়ে সাপের মত বড় চেহারায় নিয়ে এলাম। কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কেঁচোর চেহারা বড় হতে হতে একসময় সাপের মত হয়ে গেল। তবে আচারব্যবহারে সে কিন্তু সাপ নয়, পুরোপুরি কেঁচো। যদিও চেহারাতে পুরোদস্তুর একটা ময়াল।'

'তাই বুঝি টি ভিতে কেঁচোর পরেই সাপ দেখতে পেলাম।'

'এক্‌জ্যাক্টলি! তবে এনলার্জারের ওপর দিকে যে ছোট একটা বাক্সটা দেখছ, ওটা টি ভি নয়, কম্পিউটার। সব কিছুর নির্দেশ এই কম্পিউটারই করে। প্রত্যেক প্রাণীকে এনলাজ অর্থাৎ বড় করতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের দরকার। কোন প্রাণীর জন্যে কতটা সময় লাইফ এনলার্জারকে চালু রাখতে হবে, সেটাও বলে দেয় এই কম্পিউটার। স্টপ ওয়াচ লক্ষ্য রেখেই সব কাজ করতে হয় খুব সাবধানে। যেমন কেঁচোকে সাপের চেহারায় পরিবর্তিত করতে লাইফ এনলার্জারের সময় লাগে মাত্র তিন মিনিট। কিন্তু তিন মিনিটের বেশি যদি লাইফ এনলার্জারকে চালু রাখি, তা হলে কেঁচোটা বড় হতে হতে একসময় গার্ড ইউনিটের ইলেক্‌-ট্রনিক চার্জে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তা ছাড়া এই এনলার্জারটা আয়তনে ছোট। এর ভেতরের চেম্বারেরও একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে। যখনই কোন প্রাণী বড় হতে হতে ভেতরের চেম্বারের মাপকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ছাড়িয়ে যাবে, তখনই ঘটবে অঘটন। হয়তো গোটা এনলার্জারটাই তখন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

হারু ঘাড় নাড়লো। এসব ছাইপাঁশ বুঝে ওর কী লাভ? ও এখন পালাতে পারলে বাঁচে। প্রফেসর ব্রহ্ম যদি ওকেই যন্ত্রটার মধ্যে পুরে দেন। ভাবতেই ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো গায়ে!

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো হারু ঃ 'কোন বাচ্চা ছেলেকে যদি ওর মধ্যে পুরে দেওয়া যায়?'

'ছেলেটাও নিমেষে তোমার মত বড় হয়ে যাবে।' কপালটা কুঁচকে উঠলো প্রফেসর ব্রহ্মের। বললেন ঃ 'মাথায় বড় হবে ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিতে হবে না। হয়তো একটা জড়বুদ্ধি মানুষ তৈরি হতে পারে। কেননা মানুষের কোষের ক্ষেত্রে অনেক গোলমাল। সেখানে আবার ক্রোমোসোম ও লোকাসের সঠিক হিসেবনিকেশ আছে। সেসব অনেক ভজকটো ব্যাপার। আমার লাইফ এনলার্জার এখনও তা আয়ত্তে আনতে পারে নি। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো পারতে পারে। তবে অনেক সময় সাপেক্ষ। আগে আমি জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে পুরোপুরি সফল হই, তার পরে না হয় মানুষেরটা চিন্তা করব।'

'আমি এখন উঠবো।' হারু মাথা চুলকালো।

'রাতটুকু এইখানে কাটিয়ে সকালে না হয় যেতে।'

'কালকে আবার আসবখন।' হারু চলে যাচ্ছিল। প্রফেসর ব্রহ্ম ওকে ডাকলেন ঃ 'একটা কথা বলব, রাখবে ?'

'বলুন না কী ?'

'কাল আমাকে একটা বেড়াল এনে দিতে পারবে ? বড্ড ইঁদুরের উৎপাত এখানে। রিসার্চের পেপারগুলো সব কেটেকুটে নষ্ট করে দিচ্ছে।'

'এ আর এমন কী ? আমার বাড়িতে যদিও বেড়াল নেই, তবে আপনাকে ঠিক জোগাড় করে দেব।'

হারু পা বাড়ালো বাড়ির দিকে।

...তখন সবে সন্ধ্যে।

সকলেই চুপিচুপি হাজির হয়েছিল প্রফেসরের ল্যাবরেটরির জানলার কাছে। সবুজ আলোয় ভরে আছে ল্যাবরেটরির ঘরটা। প্রফেসর লাইফ এনলার্জারের সামনে বসে স্টপ-ওয়াচে লক্ষ্য করছিলেন সময়। একটানা বিপ্‌বিপ্‌ শব্দ হচ্ছিল যন্ত্রটা থেকে। কম্পিউটারের স্ক্রীনে আস্তে আস্তে ফুটে উঠলো একটা বাদুড়ের ছবি। একটু আগে যে ছবিটা ছিল একটা চামচিকের।

মৃদু হাসলেন প্রফেসর ব্রহ্ম। কম্পিউটারের সুইচ অফ করে নোট নিলেন খাতায়।

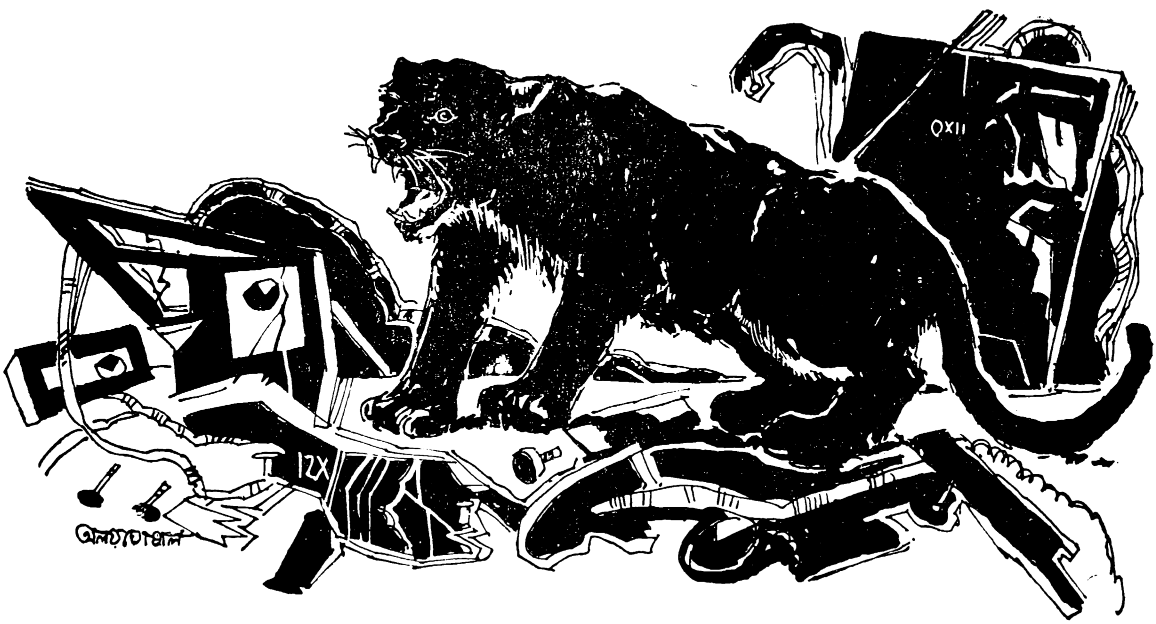

সেখানে দাঁড়িয়ে একটা কালোচিতা

পরের দিন সারা গ্রাম জুড়ে হৈ চৈ! প্রফেসর ব্রহ্ম নাকি নিমেষে কেঁচো থেকে সাপ তৈরী করেন। ছোট বাচ্চা থেকে বড় মানুষ। হারুর কথা কেউ বিশ্বাস করলো, কেউ উড়িয়ে দিল গুজব বলে। দু'একজন অত্যুৎসাহী গ্রামবাসী লুকিয়ে লুকিয়ে গেল প্রফেসরের বাড়ি, সরেজমিনে সত্যি ঘটনাটা জানতে। প্রফেসর ব্রহ্ম আবার বেশি লোকজন পছন্দ করেন না, তাই লুকিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

গাঁয়ের দারোগাবাবু তো জানতেনই, প্রফেসর ব্রহ্ম একজন মস্ত বড় বিজ্ঞানী। কিন্তু কী বিষয়ে তিনি গবেষণা করেন সেটা জানতেন না। তিনিও কৌতুহল দমন করতে না পেরে ছুটলেন ব্রহ্মের বাড়ির দিকে।

ঠিক তখনি হাঁফাতে হাঁফাতে হারু ঢুকলো। ও অবশ্য লক্ষ্য করে নি ল্যাবরেটরির জানলার বাইরে কারা দাঁড়িয়ে। ওর হাতে একটা কুচকুচে কালো রঙের বেড়ালছানা। সবে চোখ ফুটেছে। পিট পিট করে চোখের পাতা ফেলছিল বেড়ালটা।

হারু বেড়ালছানাটা টেবিলের ওপর রাখতেই প্রফেসর ব্রহ্ম হেসে ফেললেন ঃ 'এইটুকু বেড়াল ইঁদুর ধরবে কী ? ইঁদুররাই তো ওকে খেয়ে ফেলবে।'

'কী করব বড় বেড়াল কেউ দিতে চায় না যে। শেষে বোসবাড়ি থেকে চুরি করে আনলাম। দশদিনের বাচ্চা।' হেঁ হেঁ করে হাসলো হারু।

'ছিঃ ছিঃ। আমার জন্যে চুরি করতে গেলে ? তুমি

খাপু যাদের বেড়াল তাদের ফেরৎ দিয়ে এসো। ছোট বাচ্চাতে যখন আমার কাজ হবে না, মিছিমিছি রেখে লাভ কী।'

'একটা কথা বলব ?'

'কী ?'

'বাচ্চা বেড়ালটাকে মেশিনে ঢুকিয়ে বড় করা যায় না ?'

'এক্‌জ্যাক্টলি ! একথাটা তো আমার মাথায় আসে নি।' প্রফেসর ব্রহ্ম দু' আঙুলে তুড়ি দিলেন। হাত বাড়ালেন এনলার্জারের দিকে।

এনলার্জারের দরজা খুলতেই ভেতর থেকে একটা বাদুড় ডানা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে উড়ে গেল। চমকে দু'পা পেছনে সরে গেল হারু। বাদুড়টা উড়তে উড়তে একেবারে বাইরে। বাদুড়টাকে ধরার কোন চেষ্টা করলেন না প্রফেসর ব্রহ্ম।

'বাদুড়টাকে ছেড়ে দিলেন ?' হারু জিগ্যেস করল।

'ওটা বাদুড় নয়। চামচিকের বৃহৎ সংস্করণ।' হাসলেন প্রফেসর ব্রহ্ম, 'তবে সাধারণ লোক ওকে বাদুড় বলে ভুল করবে।'

'কালকের সাপটাকে কী করলেন ?'

'ছেড়ে দিয়েছি।'

'সব্বোনাশ ! কোথায় ?'

'জঙ্গলে।' প্রফেসর এনলার্জারের চেম্বারে বেড়ালছানাকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কমপিউটারের নব ঘুরিয়ে জেনে নিলেন, বেড়ালছানাকে একটা হৃষ্টপুষ্ট বেড়ালে রূপ দিতে সময় লাগবে মাত্র পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড।

এনলার্জারের সুইচ অন করে স্টপওয়াচ চালিয়ে দিলেন প্রফেসর। এনলার্জারের গা থেকে সবুজ আলো বেরিয়ে ঘরটা ভরে গেল। কমপিউটার স্ক্রীনে দেখা গেল ছোট বেড়ালছানার ছবি।

ঠিক তখনি জানলার বাইরে হৈ চৈ। বাইরে বোস-বাড়ির মেজকর্তা তারস্বরে চিৎকার করছিলেন, 'কোথায় গেল চোরটা ? এই হারু, শিগ্‌গির ফিরিয়ে দে আমার কালোসোনাকে।'

বাচ্চা বেড়ালটার নাম বোধ হয় কালোসোনা। আবার চিৎকার করলেন মেজকর্তা, 'এই যে দারোগাবাবু, আপনিও দেখছি এখানে রয়েছেন। এবারে বমাল সমেত চোরকে পাকড়ান।'

মেজকর্তা দারোগাবাবুকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ল্যাবরেটরিতে ঢোকালেন।

বেগতিক দেখে হারু আগেই লুকিয়ে পড়েছিল টেবিলের নিচে। চিৎকার চেঁচামেচিতে প্রফেসর ব্রহ্ম বিরক্তিতে চিৎকার করে উঠলেন ঃ 'কী ব্যাপার, এত হুল্লোড় কিসের ? এত লোকজনই বা কোত্থেকে এলো ? এটা কী গাঁয়ের হাট পেয়েছেন নাকি ?'

'চালাকি মারার জায়গা পান নি ? শিগ্‌গির হারুকে বের করে দিন।' হুঙ্কার ছাড়লেন মেজকর্তা।

সেই হুঙ্কারের সঙ্গে যুগপৎ আরেকটা বিকট শব্দ হলো কমপিউটার থেকে। চমকে উঠলো সবাই। প্রফেসর ব্রহ্ম স্টপওয়াচে চোখ রাখতেই মুখটা পাঁশুটে হয়ে গেল ওঁর। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় কিছুক্ষণের জন্য স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

একটু অন্যমনস্কতার ফলে স্টপওয়াচের কাঁটা পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ডের পরিবর্তে দু' মিনিট তেরো সেকেণ্ড অতিক্রম করে গেছে।

এনলার্জারের সুইচ অফ করতে যাবার আগেই আবার একটা বিস্ফোরণের শব্দ ! চোখধাঁধানো স্পার্কের আলো ছড়িয়ে চৌচির হয়ে গেল এনলার্জার। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। ল্যাবরেটরির ভেতর ও বাইরে যত লোক ছিল, সবাই তখন ভয়ে থরহরিকম্প। আচমকা বিকট শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম হলো সবার। পলক পড়ছিল না কারো চোখে।

অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখলো, লাইফ এনলার্জারটা যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে একটা কালো চিতা। চিতাটাও এত লোক দেখে যেন হতভম্ব !

এদিকে কালোচিতার ভয়ে হুটোপুটি লেগে গেল ঘরে-বাইরে। কে আগে পালাবে সেই চেষ্টাই করছিল সবাই। হারু, মেজকর্তা এমন কী দারোগাবাবু পর্যন্ত। সবাই যে যেদিকে পারলো পড়ি-কি-মরি করে ছুটলো। মুহূর্তের মধ্যে ঘর ফাঁকা। কালোচিতাটা এক লাফে বেরিয়ে গেল ল্যাবরেটরির দরজা পেরিয়ে। চিতাকে আর দেখা গেল না। হারিয়ে গেল অন্ধকারে। জঙ্গল তো এখান থেকে কাছেই।

প্রফেসর ব্রহ্ম ধপাস করে বসে পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। ঠায় দু'দিন তিনি আর উঠলেন না।

12/2, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলি-12

মহাদেশ ও মহাসাগরের জন্ম

স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি মহাসমারোহে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে নবম এশিয়ান গেমস হয়ে গেল। এশিয়ান গেমস হচ্ছে এশিয়াবাসীদের জন্যে খেলাধূলার এক বিরাট অনুষ্ঠান। এতে কেবল এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলিই অংশ গ্রহণ করতে পারে। এশিয়া এই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহাদেশ। এ ছাড়া আছে আরও পাঁচটি মহাদেশ। যেমন ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া। মহাসাগর আছে পাঁচটি ; যেমন প্রশান্ত, আটলাণ্টিক, ভারত, মেডিটেরিয়ান ও অ্যাণ্টার্টিক। এই ছয়টি মহাদেশ ও পাঁচটি মহাসাগর নিয়ে আজকের আমাদের পৃথিবীর রূপ। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, আজ থেকে 200 লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে ছিল না এত সব মহাদেশ ও মহাসাগর। তখন ছিল একটাই মহাদেশ যার নাম প্যানগিয়া (Pangea) ও একটাই মহাসাগর যার নাম প্যানথালাসা (Panthalasa)। কিভাবে ঐ একটি মহাদেশ ও মহাসাগর জন্মালো ও তার থেকে কিভাবে নানা দেশমহাদেশের সৃষ্টি হলো পৃথিবীতে, সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করব।

তোমরা অনেকেই জানো যে, পৃথিবীর জন্ম এক জ্বলন্ত গ্যাসীয় পদার্থরূপে হয়েছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হতে শুরু করে বাইরের অংশটা প্রথমে ঠাণ্ডা হয় ও পরে শক্ত কঠিন হতে থাকে। যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তখন জলীয় বাষ্প জমে জল হয়ে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়তে থাকে। পৃথিবীর বাইরের ভাগ, যেটাকে আমরা মাটি বা ভূ-পৃষ্ঠ বলি, ঠাণ্ডা হয়ে থাকার ফলে সেখানে সংকোচনের সৃষ্টি হয়। যার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু হয়। ঐসব নিচু জায়গায় জল জমা হতে থাকে বায়ুমণ্ডল থেকে। বহু লক্ষ বছর ধরে এ ঘটনা ঘটে। সৃষ্টি হয় পৃথিবীর আদি মহাসাগর বা প্যানথালাসা যা তখনকার ভূ-পৃষ্ঠের তিন ভাগের দু'ভাগই গ্রাস করেছিল। ভূ-পৃষ্ঠের তিন ভাগের এক ভাগ জলের ওপরে রইলো, জন্ম নিলো আদি মহাদেশ বা প্যানগিয়া।

বহুদিন একরকম নিশ্চিন্তে প্যানগিয়া ও প্যানথালাসা পাশাপাশি বাস করছিল। তারপর আজ থেকে 200 লক্ষ বছর আগে হঠাৎ সেই আদি মহাদেশের বুকে দেখা দিল

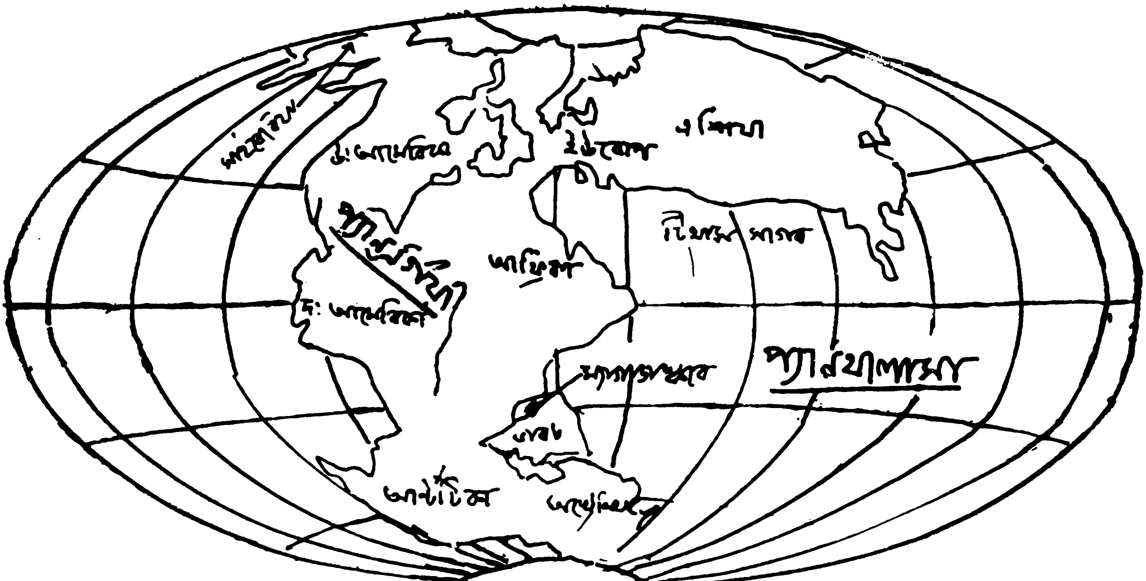

200 লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর রূপ

ফাটল। প্রথমে একটা, পরে আরও। আদি মহাদেশ ক্রমশ ভাঙতে লাগলো, সৃষ্টি হতে থাকলো এক মহাদেশ থেকে বহু মহাদেশ। আদি এক বিশাল মহাসাগরও অটুট রইলো না। সেই আদি মহাসাগর ভাগ হতে থাকলো ছোট ছোট মহাসাগরে। সেই সব মহাসাগরের মাঝে দেখা দিল নানা মহাদেশ।

200 লক্ষ বছর আগে প্যানাগিয়া প্রথমে দু'ভাগে (উত্তর-দক্ষিণে) ভাগ হয়। উত্তর ভাগে রয়ে যায় আজকের ইউরোপ, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ ভাগে থাকে আজকের আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমাদের ভারতবর্ষ। এই দুই মহাদেশের মাঝে জন্ম নিতে শুরু করে আজকের আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর একটু একটু করে আজ থেকে 180 লক্ষ বছর আগে।

উত্তর দিকের অংশ ক্রমশ আরও ভাঙতে থাকে। জন্ম নেয় এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা। এই সব মহাদেশের মাঝে দেখা দেয় ক্যারিবিয়ান, মেডিটেরিয়ান ও গালফ অফ মেক্সিকো। দক্ষিণ ভাগও ভাঙতে থাকে। দক্ষিণ ভাগে প্রথম দিকে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা একত্রে আলাদা হয় ও বাকি অংশে রয়ে যায় আণ্টার্টিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। সেই সঙ্গে আটলাণ্টিক মহাসাগর ক্রমশ বাড়তে থাকে। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, আজ থেকে 130 লক্ষ বছর আগে আটলাণ্টিক মহাসাগর কেবলমাত্র 1000 কিলোমিটার চওড়া ছিল।

আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হয় আজ থেকে 100 লক্ষ বছর আগে। 65 লক্ষ বছর আগে ইউরোপ থেকে আলাদা হয়ে গ্রীনল্যাণ্ড উত্তরে সরতে থাকে। ঐ সময়েই আণ্টার্টিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্ট্রেলিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে সরতে থাকে এবং ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তর দিকে সরতে থাকে। ভারতবর্ষ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরে যাচ্ছিল, তখন এশিয়ার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। যার ফলে হিমালয়ের সৃষ্টি হয় ও এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষ যুক্ত হয়। ক্রমশ লোহিত সাগর জন্ম নেয় আফ্রিকা ও আরবের মাঝে। আরব সাগর জন্ম নেয় ভারতের পশ্চিমে ও ভারত মহাসাগর ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই সময়েই ভারতের পশ্চিমে আরব সাগরের মাঝ থেকে অগ্ন্যুৎপাত হয়, যার ফলে লাভাস্রোত ভারতবর্ষের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রাস করে এবং এই অগ্ন্যুৎপাতের দরুন জন্ম নেয় লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ আরব সাগরের বুকে।

এইসব মহাদেশ ও দেশ সৃষ্টি হওয়ার পর এরা পরস্পর থেকে সরতে শুরু করে জন্মক্ষণ থেকেই। এখনও এইসব দেশ-মহাদেশ পরস্পর থেকে সরছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রতিবছর 2 সেণ্টিমিটারের মতো বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ আটলাণ্টিক মহাসাগর, যা এই দুই মহাদেশের মাঝে রয়েছে, প্রতি বছর ২ সেণ্টিমিটার চওড়া হচ্ছে!

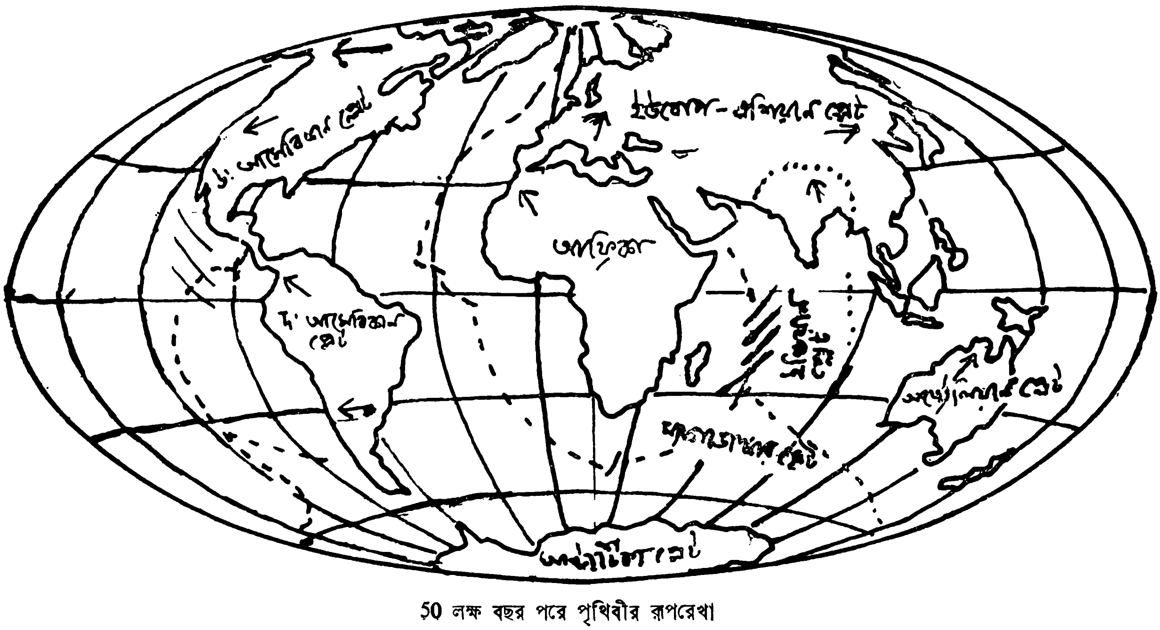

50 লক্ষ বছর পরে পৃথিবীর রূপরেখা

কেন এই ঘটনা ঘটছে এবং কি কারণে মহাদেশগুলি পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছে তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। পৃথিবী মাটি বা ভূপৃষ্ঠ থেকে 16-25 কিলো মিটার গভীর অংশকে বলে ক্রাষ্ট। ক্রাষ্ট-এর নিচের অংশকে বলে ম্যানটল, যা প্রায় 2880 কিলোমিটার গভীর। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর বহির্ভাগে ম্যানটলের ওপর ভাসমান রয়েছে কতকগুলি প্লেট. সংখ্যায় 6 থেকে 20। এই এক একটি প্লেট অনেক সময় মহাদেশ ও মহাসাগর দুটোকেই ধরে রেখেছে। এই প্লেটগুলি সর্বদা চলমান। এক একটি প্লেট 48-144 কিলোমিটার গভীর। এই সব প্লেটের সঙ্গে কিন্তু মহাদেশ বা মহাসাগরের সীমারেখার কোন সম্পর্ক নেই। এমনও হতে পারে একটি প্লেটের ওপর কয়েকটি মহাদেশ ও মহাসাগর রয়েছে, আবার কয়েকটি ছোট ছোট প্লেটের ওপর একটি বড় মহাদেশও রয়েছে। এই প্লেটগুলি সর্বদা চলমান অবস্থায় থাকার ফলে যখন পরস্পরে ধাক্কা খায়, তখন সৃষ্টি হয় পর্বতের। যেমন আল্পস পর্বত সৃষ্টি হয়েছে আফ্রিকান ও এশিয়ান প্লেটের ধাক্কা খাওয়ার ফলে এবং হিমালয়ের জন্ম হয়েছে এশিয়ান প্লেট ও ইণ্ডিয়ান প্লেটের ধাক্কা খাওয়ার ফলে। যখন প্লেটগুলি পরস্পর থেকে সরতে থাকে, তখন জন্ম নেয় সাগর মহাসাগর ঐ প্লেটগুলির মাঝে। যখন একটি প্লেট অন্য প্লেটের নিচে চলে যায়, তখন মহাদেশের বিলুপ্তি ঘটে।

এইভাবে দেশ-মহাদেশ বা সাগর-মহাসাগরের সৃষ্টি ও বিলুপ্তি আদিকাল থেকেই হয়ে আসছে। বিজ্ঞানীদের মতে ভবিষ্যতে পৃথিবীর আজকের মহাদেশের ও মহাসাগরের রূপ ভিন্ন হবে। আজ থেকে 50 লক্ষ বছর পর পৃথিবীর রূপরেখা কিরকম দাঁড়াবে তারও একটা আভাস বিজ্ঞানীরা দিয়ে রেখেছেন। তখন দেখা যাবে, আফ্রিকার পূর্ব ভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরে সরে গেছে। উত্তর আমেরিকার সানফ্রানসিসকো থেকে লস অ্যাঞ্জেলস বিচ্ছিন্ন হবে। অষ্ট্রেলিয়া উত্তরে সরে গিয়ে এখনকার জাপানের কাছে চলে যাবে। ভারত আরও উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যাবে। আটলাণ্টিক ও ভারত মহাসাগর আরও বাড়বে, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর ক্রমশ ছোট হয়ে আসবে।

পঞ্চাশ লক্ষ বছর পর এশিয়ান গেমস যদি আবার অনুষ্ঠিত হয়, তখন হয়তো এখানকার কিছু দেশ বাদ যাবে ও অন্য নতুন দেশ যোগদান করবে। অবশ্য সেই সময় মানবসভ্যতার রূপ কি হবে তার উত্তর মেলে নি।

ষ্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, রাঁচি—8 4 002

• ছবির মজা / প্রনব ঘোড়

1983'র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য

সম্পাদ্যের চিত্র অঙ্কনে সতর্ক হওয়া উচিত

অসীম মুখোপাধ্যায়

মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে পাশ করতে বা ভাল নম্বর পেতে হলে সব পরীক্ষার্থীকেই সম্পাদ্যের চিত্র অঙ্কনের ওপর নির্ভর করতে হয়। পুরো নম্বর পেতে হলে বিষয়টির জ্ঞান এবং যথেষ্ট অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে কারিগরি বা প্রযুক্তিবিদ্যায় এই অনুশীলন দারুনভাবে সাহায্য করে। এই নিবন্ধে সম্পাদ্য অঙ্কনের কিছু তাত্ত্বিক দিক এবং পরীক্ষার খাতায় কি ধরনের ভুলভ্রান্তি দৃষ্ট হয়, সেই বিষয়ে কিছু সতর্কতামূলক আলোচনা করা হবে।

উপপাদ্য অধ্যয়নের সময় জ্যামিতিক বিভিন্ন আকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত বহু ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা হয়। নিখুঁত জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন এই সব ধর্মের ওপর নির্ভরশীল। নিখুঁত জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কনই সম্পাদ্যের বিষয়বস্তু। সব বিজ্ঞানের দুটি দিক আছে—একটি তত্ত্বের এবং অপরটি প্রয়োগের। সেইরকম জ্যামিতিশাস্ত্রেরও দুটি দিক আছে—একটি উপপাদ্যের (তত্ত্ব) এবং অপরটি সম্পাদ্যের (প্রয়োগ)। সম্পাদ্যের চিত্র অঙ্কনের জন্যে যে যন্ত্রগুলির প্রয়োজন পড়ে তা হলো: (ক) স্কেল (খ) কম্পাস (গ) চাঁদা ইত্যাদি। এসবের সঙ্গে পেনসিল এবং কাগজ যে অপরিহার্য তা বলাই বাহুল্য।

নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রেখাংশ মাপা এবং আঁকার জন্যে প্রয়োজন পড়ে স্কেলের, নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের বৃত্ত বা বৃত্তচাপ আঁকার জন্যে প্রয়োজন কম্পাসের এবং কোন কোণ মাপা বা আঁকার জন্যে দরকার চাঁদার। এই যন্ত্রগুলি ব্যবহার না করে হাতে বা অন্য উপায়ে সম্পাদ্যের চিত্র অঙ্কন করা কোন মতেই উচিত নয়; পরীক্ষার্থী যত ভাল চিত্রকরই হোক না কোন।

দেখা যায়, বহু পরীক্ষার্থী স্কেল ব্যবহারে মোটেই দক্ষ নয়। পরীক্ষার জন্যে একটু ভাল মানের স্কেল দরকার, যার সাহায্যে রেখাংশ সরল হবে এবং সঠিক মাপ পাওয়া যাবে। স্কেলের দু ধারে দু ধরনের মাপের দাগ থাকে; এক ধারে ইঞ্চির এবং অপর ধারে সেণ্টিমিটারের। তিন সেণ্টিমিটার রেখাংশ আঁকতে গিয়ে বহু পরীক্ষার্থী কোন নম্বর পায় না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, স্কেলের মাপ শুরু হয় স্কেলের ঠিক ধার থেকে নয়, পরন্তু একটু ব্যবধানে। পরীক্ষার্থীরা হিসেব শুরু করে স্কেলের কিনারা থেকে, ফলে মাপে কয়েক মিলিমিটারের ত্রুটি থেকে যায়। তা ছাড়া মাপবার সময় পরীক্ষার্থীর চোখ ঠিক সংশ্লিষ্ট দাগের ওপর না থাকলে আর এক ধরনের ত্রুটির (দৃষ্টিভ্রমজনিত) উৎপত্তি হয়। দেখা যায়, স্কেল ঠিকমত বসানোর ত্রুটিতে দুটি বিন্দু-সংযোজক রেখা ঠিক মত দুটি বিন্দু দিয়ে যায় না, একটু সরে যায়। এই সব ত্রুটির জন্যে পরীক্ষক কিছু নম্বর অনায়াসেই কেটে নেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, বৃত্ত বা বৃত্তচাপ আঁকার জন্যে কম্পাসের প্রয়োজন। কোন একটি রেখা থেকে নির্দিষ্ট মাপের রেখাংশ কেটে নিতে হলে, কম্পাসের সাহায্যে সেই রেখার ওপর সুস্পষ্ট বৃত্তচাপ অঙ্কন করতে হয়। কম্পাসের কাঁটাযুক্ত দণ্ডটি ঠিকমত বসাতে না পারলে বা পেনসিলযুক্ত দণ্ডটি শিথিল বা নড়বড়ে হলে, ঈপ্সিত বৃত্ত বা বৃত্তচাপ কখনই পাওয়া যায় না। দেখা যায়, পরীক্ষার্থীরা এই সব ক্ষেত্রে দুটি বৃত্ত বা চাপ পাশাপাশি এঁকে ফেলে। নির্দিষ্ট বৃত্তচাপ অঙ্কিত না হলে বা বক্র রেখাটি মোটা বা অপরিচ্ছন্ন হলে পরীক্ষক বেশ কিছু নম্বর কেটে নেন। বৃত্তচাপ অযথা দীর্ঘ হওয়া যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি এমন ক্ষুদ্রাকৃতি বা আবছা হওয়া উচিত নয় যাতে পরীক্ষককে কষ্ট করে বুঝে নিতে হয়। চিত্রে অনেকগুলি বৃত্তচাপ থাকলে লক্ষ্য রাখা উচিত এগুলির সংশ্লিষ্ট ছেদবিন্দুসমূহ যেন বেশ ব্যবধানে থাকে। মোট কথা, চিত্রটিকে সুদৃশ্য এবং পরিচ্ছন্ন করার জন্যে পরীক্ষার্থীর সচেষ্ট হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, ঈপ্সিত চিত্রটি রেখে বাকি সব অঙ্কন চিহ্ন রাবার দিয়ে মুছে ফেলা। এই ঘটনার নজির বিরল নয়। যথাযথ অঙ্কন চিহ্নের ওপর পরীক্ষায় নম্বর দেওয়ার নির্দেশ থাকে। হাতে অঙ্কন চিহ্ন বসিয়ে পরীক্ষককে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়।

এর পরের আলোচ্য যন্ত্রটি হলো চাঁদা। অনেক সময় পরীক্ষার্থীরা চাঁদাটি ঠিকমত বসাতে ভুল করে। ফলে কোণ

মাপা বা আঁকার ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা যায়। চাঁদার সাহায্যে কোন কোণ মাপতে বা আঁকতে গেলে দেখতে হবে কোণের একটি বাহু যেন চাঁদার পরিধির দাগকে অতিক্রম করে। চাঁদার সাহায্য ব্যতীত কোন কোণ আঁকার নির্দেশ থাকলে, চাঁদা আদৌ ব্যবহার করা উচিত নয়। যে কোণগুলি যথা, 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, $22\frac{1}{2}$°, 15° ইত্যাদি স্কেল-কম্পাসের মাধ্যমে আঁকা যায়, সেগুলির যথেষ্ট অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকতে পারলে 60° কোণ পাওয়া যায়, 60° কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে 30° কোণ পাওয়া যায়। কিন্তু বহু কোণ আছে যা স্কেল-কম্পাসের মাধ্যমে আঁকা সম্ভব নয়, যথা 70°, 10° ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে অবশ্যই চাঁদা ব্যবহার করতে হবে।

পেনসিল ও কাগজ সম্পর্কে কিছু বলার আছে। পেনসিল হার্ড প্রকৃতির হলে অঙ্কন চিহ্ন সুস্পষ্ট হয় না, এরপর লোড্‌শেডিং-এ মোমবাতি বা হ্যারিকেনের আলোয় অঙ্কন চিহ্নাদি আরও অস্পষ্ট বা ঝাপসা দেখায়। তাই মিডিময় বা সফ্‌ট পেনসিল ব্যবহার করা উচিত, যাতে প্রতিটি অঙ্কন চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিত্রে কালি ব্যবহার করা উচিত নয়। পেনসিলের (কম্পাসেরও) শিস সরু না হলে, অঙ্কন চিহ্ন সূক্ষ্ম হয় না ; এর ব্যবহারে পরীক্ষার্থীর যথেষ্ট সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অঙ্কন চিহ্ন সূক্ষ্ম না হলে, ঈপ্সিত বিন্দু নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় না। পরীক্ষাকক্ষে চিত্র অঙ্কনের জন্যে আলাদা কাগজ দেওয়া হয় না, যেমন দেওয়া হয় লেখাচিত্র অঙ্কনের জন্যে। তাই খাতাতেই চিত্র আঁকতে হয়। খাতার ডান দিকের পাতায় ওপর দিকে চারধারে যথেষ্ট ফাঁক (মার্জিন) রেখে চিত্রটি আঁকা হবে। অঙ্কনের সময় রাবার ব্যবহার না করাই ভালো। পরীক্ষামূলকভাবে চিত্রটির একটি খসড়া অন্যত্র করে নিলে প্রকৃত চিত্রটিতে রাবার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। বলা বাহুল্য লম্বা লাইন কেটে খসড়াটি বাতিল করা উচিত এবং প্রকৃত চিত্রে অঙ্কনের আগেই প্রশ্ন নম্বর লিখে রাখা শ্রেয়।

বিশেষ কয়েকটি চিত্রাঙ্কনের সমস্যায় আসা যাক। প্রশ্নে যদি বাহু এবং বিন্দুর নামকরণ থাকে, অঙ্কিত চিত্রে হুবহু তাই হওয়া চাই। যথাযথ নামকরণ চিত্রে না থাকলে পরীক্ষক সেক্ষেত্রে শূন্য দেবার পক্ষপাতী। প্রশ্নে কোন নামকরণের ইঙ্গিত না থাকলে পরীক্ষার্থীর নিজেরই উচিত চিত্রে নামকরণ করে নেওয়া, কারণ সমগ্র চিত্রটি অঙ্কনের পর ঈপ্সিত চিত্র কোন্‌টি তা নামকরণের মাধ্যমেই বোঝানো দরকার। তা ছাড়া প্রশ্নে অঙ্কন পদ্ধতির ব্যাখ্যা লেখার নির্দেশ থাকলে, নামকরণ অপরিহার্য। অনেক সময় দেখা যায়, পরীক্ষার্থী প্রশ্নের বাহু এবং কোণ ইত্যাদি আলাদাভাবে এঁকে নেয় এবং পরে প্রয়োজনীয় চিত্রটি আঁকে। যদি বিশেষভাবে প্রশ্নে নির্দেশ না থাকে, তা হলে বাহু বা কোণ আলাদাভাবে আঁকার কোন প্রয়োজন নেই। বিশেষ নির্দেশ থাকলেই তার জন্যে নম্বর বণ্টিত থাকে, নচেৎ নয়। ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ ইত্যাদির কৌণিক বিন্দু পেতে গেলে যে বৃত্তচাপ অঙ্কনের প্রয়োজন সেই অঙ্কন চিহ্ন চিত্রে না থাকলে পরীক্ষার্থী কোন নম্বর পায় না। চতুর্ভুজের সমক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কনের ক্ষেত্রে একটি সমান্তরাল রেখা আঁকার প্রয়োজন পড়ে। সমান্তরাল রেখা আঁকার যে পদ্ধতি (একান্তর বা অনুরূপ কোণের সমতা), সেই পদ্ধতি অনুসারে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় অঙ্কনচিহ্নাদি চিত্রে দৃষ্ট না হলে, পরীক্ষক কোন নম্বর দেন না। তা ছাড়া সমক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ঈপ্সিত ত্রিভুজটি (নামকরণের মাধ্যমে) চিত্রের তলায় উল্লেখের প্রয়োজন আছে। চিত্রে অনেকগুলি ত্রিভুজ সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, সেই বিভ্রান্তি নিরসনের দায়িত্ব পরীক্ষার্থীর। এই প্রসঙ্গে দুটি রেখাংশের মধ্যসমানুপাতী অঙ্কনের কথা এসে পড়ে। চিত্রে কোন্ রেখাংশটি মধ্যসমানুপাতী তা কোথাও উল্লেখ না থাকলে পরীক্ষক কেন নম্বর দেবেন ? এই বিষয়টির প্রতি সকল পরীক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। ত্রিভুজের অন্তর্লিখিত এবং পরিলিখিত বৃত্ত দুটি অঙ্কনের জন্যে দুটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। দুটি ক্ষেত্রেই প্রথম কাজ সংশ্লিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্রটির স্থান নির্ণয় করা। বলা বাহুল্য, যে কোন দুটি বাহুর (ত্রিভুজের) লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের ছেদবিন্দু পরিলিখিত বৃত্তের কেন্দ্র এবং যে কোন দুটি কোণের (ত্রিভুজের) সমদ্বিখণ্ডকের ছেদ-বিন্দু অন্তর্লিখিত বৃত্তের কেন্দ্র। কেন্দ্রটি পাবার পর বৃত্তটি আঁকার কাজ ; যদি সংশ্লিষ্ট বৃত্ত ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক বিন্দুগামী (পরিলিখিত বৃত্ত) না হয় বা তিনটি বাহুকে স্পর্শ না করে (অন্তর্লিখিত বৃত্ত) তা হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। তাই প্রথম থেকেই প্রতিটি ধাপে সতর্ক না হলে অঙ্কিত বৃত্তটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। তবে বৃত্ত আগে এঁকে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সার্থকতা নেই। কারণ এ সব ক্ষেত্রে বৃত্তের নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ থাকে, সে ব্যাসার্ধ পরীক্ষার্থী পাবে কোথায় ! কোন প্রাগ্রসর পরীক্ষার্থীর পক্ষে এই ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা সম্ভব হলেও তার ব্যবহার সম্পাদ্যের অঙ্কন পদ্ধতির নিয়মবিরুদ্ধ। প্রশ্নে কখন কখন অঙ্কিত বৃত্তের ব্যাস বা ব্যাসার্ধ মাপতে বলা হয়। চিত্রে ব্যাস বা ব্যাসার্ধ নির্দেশক রেখাংশ অবশ্যই এঁকে নিতে হবে এবং তারপর

স্কেল বসিয়ে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হবে। এই নির্দেশ যে কোন মাপের ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়, অর্থাৎ যা মাপা হবে তা যেন চিত্রে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যাস ও ব্যাসার্ধের সংজ্ঞার পার্থক্য সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার্থী অবহিত নয়।

অনেক অঙ্কনের বিকল্প পদ্ধতি আছে, পরীক্ষার্থী খুশীমত যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে। কোন অঙ্কন পদ্ধতির সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর নিজস্ব কোন পদ্ধতি থাকলে তা ব্যবহারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পরীক্ষার্থীর আছে, অবশ্য পদ্ধতিটি প্রমাণগ্রাহ্য হওয়া চাই। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সমকোণ অঙ্কনের জন্যে পরীক্ষার্থী একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করতে পারে যার, তিনটি বাহু *3*, 4, 5 একক বা একটি অর্ধ বৃত্তস্থ কোণও আঁকতে পারে। কোন কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করার সময় পরবর্তী চাপদ্বয়ের ব্যাসার্ধ আগের চাপের ব্যাসার্ধের সমান নাও নেওয়া যেতে পারে, এমন কি পরবর্তী চাপদ্বয়ের ছেদ-বিন্দু প্রদত্ত কোণের বিপরীত দিকে অঙ্কন করা যেতে পারে। সমবাহু ত্রিভুজের পরিলিখিত এবং অন্তর্লিখিত বৃত্তের কেন্দ্রদ্বয় একই বিন্দু হয় বলে, যে কোন বাহুদ্বয়ের লম্বসমদ্বিখণ্ডক অথবা কোণদ্বয়ের সমদ্বিখণ্ডকের মাধ্যমে দুটি বৃত্তের কেন্দ্রের স্থান নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু যে পদ্ধতি সাধারণ অর্থাৎ যা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করাই শ্রেয়। নিচে কতকগুলি মৌলিক অঙ্কনের বিষয় পরীক্ষার্থীর অনুশীলনের জন্যে উল্লেখ করা হলো, যেগুলি সব চিত্রাঙ্কনেই প্রয়োজন পড়েঃ

ক) একটি নির্দিষ্ট রেখাংশকে সমদ্বিখণ্ডিত করা

খ) একটি নির্দিষ্ট কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করা

গ) একটি কোণের সমান করে আর একটি কোণ আঁকা

ঘ) একটি রেখার সমান্তরাল করে আর একটি রেখা আঁকা

ঙ) একটি রেখার নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে লম্ব উত্তোলন করা

চ) একটি বিন্দু থেকে (বহিঃস্থ) একটি রেখার ওপর লম্বপাত করা

ছ) নির্দিষ্ট কয়েকটি মাপের কোণ ($90°$, $60°$, $45°$, $30°$, $22\frac{1}{2}°$ $15°$ ইত্যাদি) আঁকা।

একটি কথা এই সূত্রে বলে রাখার প্রয়োজন আছে, উপপাদ্যের সংশ্লিষ্ট চিত্র অঙ্কনের সময়, সম্পাদ্যের চিত্র অঙ্কনের মত এত শত বিধিনিয়ম পালনের প্রয়োজনীয়তা নেই। কোন কোন পরীক্ষার্থী উপপাদ্যের চিত্রটি নিখুঁত অঙ্কন চিহ্ন সহ খাতায় আঁকে। এতে পরীক্ষার্থীর সময়ই নষ্ট হয়। তবে উপপাদ্যের চিত্রে রেখা ও বৃত্ত আঁকার সময় চিত্রটি নিষ্ঠাসহকারে আঁকা উচিত এবং এটি যেন বাস্তব বা বিবৃতি-অনুগ হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সম্পাদ্যের অঙ্কন পদ্ধতির ব্যাখ্যা চাওয়া হতে পারে। তাই প্রতিটি অঙ্কনের সঙ্গে তার ব্যাখ্যাও পরীক্ষার্থীর ভালমত প্রস্তুত করা উচিত। খাতার যে পৃষ্ঠায় চিত্র অঙ্কিত হবে সেই পৃষ্ঠারই তলায় ব্যাখ্যাটি লেখা হবে এবং ঐ পৃষ্ঠায় এটি সমাপ্ত হওয়া সমীচীন। অঙ্কনে পর পর কি করা হলো সেগুলি অল্প কথায় ক্রমানুসারে এক একটি অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যায় সাজিয়ে লিখলেই চলবে। চিত্রের তলায় ঈপ্সিত চিত্রটি নামকরণের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার কথা আগেই বলা হয়েছে। ব্যাখ্যার শেষেও ঈপ্সিত চিত্র কোন্‌টি তা অবশ্যই পুনরুল্লেখ করতে হবে। দেখা যায়, বহু পরীক্ষার্থী অঙ্কনের কাজ ভালই করে, কিন্তু অঙ্কন পদ্ধতির ব্যাখ্যার সময় এতই বিশৃঙ্খল এবং অসংলগ্ন কথা লেখে যে পরীক্ষক খুবই অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত বোধ করেন এবং ঐ অংশে কোন নম্বর দেন না।

প্রশ্নপত্রে অঙ্কনের কোন প্রমাণ চাওয়া হয় না। তাই পরীক্ষার্থীরা নির্ভয়ে এবং নির্দ্বিধায় প্রমাণ অংশটি প্রস্তুতি থেকে বাদ দেয়। এতে অবশ্য তাদের পরীক্ষায় কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু উৎসাহী এবং গণিত অনুরাগী প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কর্তব্য সব সম্পাদ্যেরই প্রমাণ জেনে রাখা।

বিশিষ্ট পক্ষিবিজ্ঞানী অজয় হোমের

বাংলার পাখি

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২০.০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর সন্ধানে

চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

প্রাণিজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে মেরুদণ্ডী প্রাণীর চরম রূপ হলো মানুষ। কিন্তু পৃথিবীতে কখন এলো এই মেরুদণ্ডী প্রাণী আর এই প্রাণী হিসাবে কারাই বা প্রথম? পাহাড়ের গায়ে গায়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জানা গেল, পৃথিবীর প্রথম অধিকল্প প্যালিওজাইক যুগের দু'কোটি বছর স্থায়ী সিলুরিয়ান বিভাগের শেষে জলজগতে প্রথম যে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তা হলো মাছ। পরবর্তী ডিভোনিয়ান বিভাগে, যার স্থায়িত্বকাল ছিল ছ'কোটি বছর, এরা পুরোদমে পৃথিবীর উপর দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করে গেছে। পৃথিবী বলতে অবশ্য তখন জলভাগই—স্থলভাগ ছিল না। স্থলভাগের প্রথম সূচনা অবশ্য এই বিভাগেরই শেষদিকে। তাই সেই যুগটাকে বলা হত মৎস্য যুগ। মাছগুলো ছিল লম্বায় দু-তিন ফুটেরই বেশি; আবার কুড়ি ফুটও ছিল। এই মেরুদণ্ডী প্রাণীরাই ক্রমে জল থেকে উভচর এবং উভচর থেকে স্থলচর। তারপর একসময় সারা স্থলভাগের উপর যে রূপে এরা নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করে বসলো সে রূপটি হলো মানুষ। কোটি কোটি বছর আগে অবলুপ্ত প্রাণীর জীবাশ্মের সূত্র ধরে বিজ্ঞানীরা মানুষের ক্রমবিবর্তনের ধারা-পথে এগিয়ে এসেছিলেন ঠিকই, তবুও একটু দ্বিধা থেকে গিয়েছিল। কোন্ সেই বিশেষ প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী, যারা উভচর বৃত্তি পরিত্যাগ করে পুরোপুরি স্থলচর হলো, যার সঙ্গে মেরুদণ্ডী মানুষের যোগসূত্র ঠিকমত মেলানো যেতে পারে? বহুকাল যাবৎ কোন জীবাশ্মই তাঁদের এই সন্ধান দিতে পারে নি।

কিন্তু ঘটনাচক্রে সে সূত্রও একদিন এসে গেল বিজ্ঞানীদের হাতে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই। আর সেই সূত্র এলো কোন জীবাশ্মের আকারে নয়, একেবারে জীবন্তরূপে।

12 ডিসেম্বর, 1938। এক জেলে-নৌকো মাছ ধরতে বেরিয়েছিল পূর্ব-লণ্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিমে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে? জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন গুসেন। আকাশের কোথাও এতটুকু মেঘ নেই, ঝড়ের লক্ষণও নেই। ঝকঝকে দিন। ওহালুমা নদীর বুকে তিন মাইল লম্বা জাল ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে জাহাজ উত্তর-পূর্ব দিকে। জলের চল্লিশ ফ্যাদাম অর্থাৎ প্রায় দুশো চব্বিশ ফুট নিচ পর্যন্ত জল কেটে এগিয়ে চলেছে জাল। কিছুদূর গিয়ে একসময় জাল গুটিয়ে তোলা হলো ডেকে। প্রচুর মাছ পড়েছে জালে। প্রায় তিন টন হবে। এই অঞ্চলটায় সাধারণত মাছ পাওয়া যায় না বলে নৌকোও আসে না বড় একটা। সকলেই মহাখুশী। ঝটিতি শুরু হয়ে গেল বাছাই-এর কাজ। ছোট-মাঝারি-বড়, জীবন্ত-মৃত-অর্ধমৃত হরেক রকমের মাছ। কয়েক জোড়া হাত যন্ত্রের মতো দ্রুত বাছাই করে চলেছে সেই বিরাট স্তূপ। দেখতে দেখতে অনেক হাল্কা হয়ে গেল। এবার প্রায় শেষ। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো বাছাইকারীরা। বড় হয়ে উঠলো তাদের চোখ জোড়া—এ কী মাছ রে, বাবা! মাছ, না অন্য কিছু? নীল ইস্পাতের মত ঝকঝকে বড় বড় আঁশ; গভীর নীল আর বিরাট বড় চোখ যেন আগুনের মতো জ্বলছে। পিঠে একজোড়া ডানা। ডানার রকমটাই কেমন যেন অস্বাভাবিক। খবর গেল ক্যাপ্টেনের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন গুসেন। তিনিও হতবাক! দীর্ঘকাল মাছ নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। কোন মাছই তাঁর অপরিচিত নয়। কিন্তু এ কী মাছ! তখনো বেঁচে আছে মাছটা। জীবন্ত তাকে ধরার চেষ্টা করলো সকলে। কিন্তু কাছে যেতেই যে বিকট ভয়াল ভঙ্গীতে সে তেড়ে আসতে লাগলো তাতে সাধ্য কার যে কাছে এগোয়! এইভাবে কেটে গেল প্রায় তিন ঘণ্টা। তারপর একসময় আস্তে আস্তে স্থির হয়ে গেল মাছটা।

জাহাজ ফিরে এলো পূর্ব লণ্ডনে। ক্যাপ্টেন গুসেন মাছটা তুলে দিলেন পূর্ব লণ্ডন মিউজিয়মের কিউরেটর মিস কার্টনে ল্যাটিমারের হাতে। ল্যাটিমারও বিস্মিত! অনেক অনুসন্ধান করেও ঠিকমত সনাক্ত করতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে বিবরণ দিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকার সুবিখ্যাত মৎস-বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. এল. বি. স্মিথকে। তিনি ছিলেন গ্রাহামস্টাউন রোডস ইউনিভারসিটি কলেজের অধ্যাপক। ল্যাটিমারের চিঠি যখন গেল, অধ্যাপক তখন ছুটিতে গেছেন নায়সায়। তাই ঘুরপথে তাঁর কাছে খবর গিয়ে পৌঁছোতে সময় লেগে গেল দশ দিন। ইতিমধ্যে মাছটা ভিতর থেকে পচে ফুলে উঠতে শুরু করেছে। বাধ্য হয়েই নিরুপায় ল্যাটিমার পচে-ওঠা মাংস আর শিরা-উপশিরার কিছু অংশ কেটে ফেলে দিয়ে

ছাল, মাথার খুলি, মেরুদণ্ডের সামান্য অংশ আর বুকের ওপর দিয়ে কোমরবন্ধের কিছুটা, অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব সংরক্ষণ করে রাখলেন।

এদিকে ল্যাটিমারের পাঠানো ছবি আর বিবরণ পড়ে অধ্যাপক স্মিথ বিহ্বল হয়ে উঠলেন! জীব-বিজ্ঞান জগতের সেই হারিয়ে-যাওয়া যোগসূত্র, যার অনুসন্ধান তাঁরা করে আসছিলেন সুদীর্ঘকাল ধরে, তারই আবিষ্কার ঘটে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক সেই মৎস্য যুগ, আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে যার অবলুপ্তি ঘটেছে, এ হলো তাদের সেই পরিবারের প্রতিনিধি, যারা বিবর্তনের ধারা এড়িয়ে আজও বেঁচে আছে জীবন্ত-ফাসিলরূপে। কিন্তু এখনই নিঃসংশয় হওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিমারের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো। হতাশ হলেন স্মিথ। দোষ নেই ল্যাটিমারের। তবে মাছটাকে ফেলে দেবার আগে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তার শারীর-বিশ্লেষণ যেভাবে রেখে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রকে পরিচ্ছন্ন করেছিলেন, তারই জন্যে স্মিথ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জীবন্ত ফসিল এই মাছটির নাম রাখলেন 'ল্যাটিমারিয়া'।

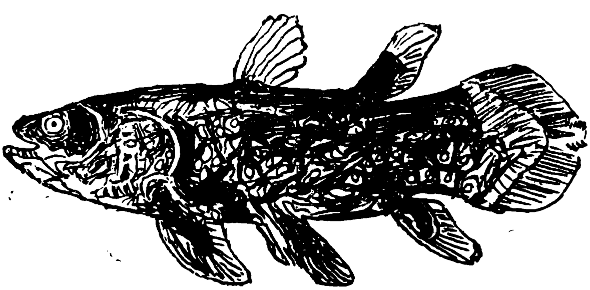

ল্যাটিম্যারিয়া

উপায়ান্তর না দেখে সংরক্ষিত অংশটুকুর উপরই গবেষণা চালালেন অধ্যাপক। ধারণা অমূলক নয়। কিন্তু নিঃসংশয় হওয়ার জন্যে চাই জীবন্ত নমুনা। অধ্যাপক স্মিথের ধারণা জন্মালো—এরা থাকতে পারে মাদাগাস্কার এবং আফ্রিকার প্রধান ভূ-খণ্ডের মাঝে মোজাম্বিক প্রণালীর অল্প-গভীর জলে। নিজেই উদ্যোগ নিয়ে চালালেন অভিযান। সফল না হলেও নিরুৎসাহ হলেন না।

এর কিছুদিনের মধ্যেই হাজার হাজার ছাপানো আবেদন-পত্র ছড়িয়ে পড়লো ভারত মহাসাগরের পশ্চিমে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ছড়ালেন অধ্যাপক স্মিথ। 'ল্যাটিমারিয়া' মাছের কল্পিত ছবি-আঁকা সেই পত্রে আবেদন জানালেন —দুটো জীবন্ত মাছ চাই। প্রত্যেকটির জন্যে একশ' পাউণ্ড পুরস্কার। নিজেও ঘন ঘন আসা-যাওয়া শুরু করলেন পূর্ব-আফ্রিকার উপকূলে। জনে জনে দেখা-সাক্ষাৎ করতে শুরু করলেন যাতে তাঁর আবেদন কেউ ভুলে না যায়। সেই আবেদনপত্রটি ছিল তিন ভাষায়—ইংরেজি, ফরাসী আর পোর্তুগীজে।

এইভাবে কেটে গেল বারো বছর। 20 ডিসেম্বর, 1950। আহমদ হোসেন নামে একজন স্থানীয় গরীব মানুষ দিনের নির্দিষ্ট কাজ সেরে কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের আনজুয়ান দ্বীপে ছিপ ফেলেছে যদি একটা মাছ ধরা যায় দিনের অভাব ঘুচবে, এই আশায়। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই এক দুরন্ত টান। ছিপে যতটুকু সুতো ছিল, বেরিয়ে গেল। এবার বুঝি ছিপটাও হাতছাড়া হয়ে যায়। রুখে দাঁড়ালো আহমেদ হোসেন। শুরু হলো যমে-মানুষে টানাটানি। বেশ কিছুক্ষণ লড়াই শেষে এক শরীর জবজবে ঘাম নিয়ে সে ডাঙায় তুললো মাছটাকে। খুব আনন্দ হোসেনের মাছটাকে দেখে। ওজন হবে প্রায় একশ' পাউণ্ড। কিন্তু এ কী কাণ্ড! কাছে গেলেই যে বিকট-সিকট করে তেড়ে আসে। বাধ্য হয়েই হোসেন তার মাথায় বসালো বেশ কয়েক ঘা লাঠি। থেঁতলে গেল মাথা, মারা গেল মাছটি। এবার নিশ্চিন্তে সেটা কাঁধে তুলে চললো বাজারের দিকে; কেটে টুকরো করে বিক্রি করবে। কিন্তু বাজার পর্যন্ত যেতে হলো না হোসেনকে। মাঝপথেই আটকালেন আর একজন। আরে, এ যে অধ্যাপক স্মিথের ছাপানো আবেদনপত্রের ঠিক সেই মাছটার মতো। তবে আকারে তার দ্বিগুণ। হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে মাছটাকে তিনি নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন ই. ই. হাণ্টের কাছে। হাণ্ট হলেন বাণিজ্য জাহাজের মালিক। হাণ্ট করলেন কি, মাছটা যাতে নষ্ট হয়ে না যায় শরীরের প্রায় সর্বত্রই নুন মাখিয়ে রেখে তারবার্তা পাঠালেন অধ্যাপক স্মিথকে।

ডঃ মালান তখন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী। তিনি একটি বিশেষ উড়োজাহাজের বন্দোবস্ত করে দিলেন অধ্যাপক স্মিথের আসবার জন্যে। এলেন অধ্যাপক। পচন-শীলতার হতে থেকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা ইনজেকশনও দিলেন। কিন্তু আবিষ্কারের এক বিরাট সম্ভাবনাকে এইভাবে থেঁতলানো এবং ক্ষত-বিক্ষত দেখে তিনি প্রায় কেঁদে ফেললেন। যদিও মাছটির এই অবস্থায় গবেষণার সিদ্ধান্তে আসতে তাঁর প্রায় দু'বছর লেগে যাবে, তবুও মাছটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি। এরই মধ্যে একটু আশ্বস্ত হলেন এদের আবাস-স্থলের সঠিক সন্ধান পেয়ে।

ইতিমধ্যে ফরাসী বিজ্ঞানীরাও তৎপর হয়ে উঠেছেন

সেপ্টেম্বর, 1953। ধরা পড়লো আর একটি মাছ। কোনরকমে সেই মাছটিকে অক্ষত অবস্থাতেই পরীক্ষার জন্যে আনা হলো আনতানানারিভোর মাদাগাস্কার গবেষণা-কেন্দ্রে। 1954 সালের মাঝামাঝি ফরাসী কর্তৃপক্ষের অধীনে ধরা পড়লো আরও তিনটি জীবন্ত নমুনা। ফরাসী প্রাণী-বিজ্ঞানী জে. এইচ. মিলট তার উপর গবেষণা করে হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্রের তথ্য তুলে দিলেন অনুসন্ধিৎসুদের হাতে।

এরা হলো 'ক্রসোপটারিজি' অর্থাৎ ঝালর ডানা' গোষ্ঠীর প্রধান বিভাগ, বিবর্তনের ধারায় পৃথিবীতে যারা প্রথম এসেছিল দুটো ফুসফুস নিয়ে, যার ফলে এরা পারত বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিতে। বিজ্ঞানীরা অনেকখানি নিশ্চিন্ত হলেন, আশ্বস্ত হলেন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হারিয়ে-যাওয়া যোগসূত্র 'ল্যাটিমারিয়া-কে পেয়ে। মানুষের ক্রমবিকাশের ধারায় সরাসরি এদের যোগসূত্র কতখানি, সেবিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত না হলেও ল্যাটিমারিয়া জীব-জগতের গুরুত্বপূর্ণ এক ধারায় উৎস-মুখের সন্ধান এনে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের হাতে।

গ্রাম ও পোঃ—গুরাপ, জেলা-হুগলী।

শীতের ভয়

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কোথাও কিছু নেই খোকা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হাঁচতে আরম্ভ করলে। তারপর নাক দিয়ে জল গড়াতে লাগলো! মা বললেন, দেখেছ খোকার ঠাণ্ডা লেগে গ্যাছে। কত করে বলি শীত পড়েছে গায়ে গরম জামা দাও, বেশি জল ঘেঁটো না। সে কথা কি কেউ শোনে। জ্বর হলে আমাকেই তো ভুগতে হবে।

সত্যিই তাই হলো। হাঁচির সঙ্গে কাশি শুরু হলো, তার পর জ্বর এসে গেল। তার এক খেলার সাথীরও সর্দিজ্বর হয়ে গেল। খোকার সাথীর মা কিন্তু ছেলেকে খুব সাবধানে রাখেন। গরম জামা পরিয়ে রাখেন। গরম জলে চান করান। তবুও ছেলের ঠাণ্ডা লেগে গেল। তার মা তো ভেবে পান না—এত সাবধান থেকেও কেন অসুখ করে। মায়ের দোষ নেই, খোকারও দোষ নেই। আসল গলদটা যে অন্য জায়গায়। আমাদের সর্দি জ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি যে সব অসুখ হয় সে তো শুধু ঠাণ্ড লাগার জন্যে নয়। এ রোগগুলি খুউব ছোট জীবাণু শরীরে ঢুকলে হয়। সাধারণ জীবাণুর (ব্যাকটিরিয়া) চেয়েও ছোট। এদের বলা হয় ভাইরাস। ভাইরাসগুলির আবার নানা জাত। কেউ সাধারণ সর্দিজ্বর করায়, কেউ ইনফ্লুয়েঞ্জা ঘটায়, কেউবা ডেংগু জ্বর করে। এ ধরনের রোগগুলির লক্ষণ প্রায় একই ধরনের। কষ্ঠ বা উপসর্গের কম বেশি হয়। ঐ ভাইরাসগুলি হাওয়ায় ভর করে উড়ে বেড়ায়। প্রশ্বাস নেওয়ার সময় বাতাসের সঙ্গে ভাইরাসগুলি শ্বাস-নালী দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। শরীরে প্রবেশ করে তাদের বংশবৃদ্ধি হয় ফলে জ্বর কাশি, নাক দিয়ে জলপড়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এগুলি ছোঁয়াচে রোগ। একজনের সর্দিকাশি জ্বর হলে তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে অসংখ্য ভাইরাস বেরিয়ে আসে এবং কাছাকাছি যারা থাকে তাদের শরীরে ঢোকবার চেষ্টা করে। সাধারণত খুব কাছাকাছি না থাকলে (3 ফিটের মধ্যে) এ ধরনের ছোঁয়াচ হবার সম্ভাবনা কম। যাদের রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কম, তাদেরই বেশি হবার সম্ভাবনা। এ রোগের প্রাদুর্ভাব শীতকালেই বেশি। এ সময়ে প্রথমতঃ আবহাওয়া ধোঁয়া ও কুয়াশায় ভারী থাকে। ঠাণ্ডার ভয়ে রাত্রে দরজা জানালা বন্ধ রাখা হয়। উপযুক্ত হাওয়া চলাচল না থাকলে ঘরের হাওয়া বাসিন্দাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমান্বয়ে দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে বায়ুচালিত ছোঁয়াচে রোগ বেড়ে চলে। ঠাণ্ডা লাগার কথাটা একদম উড়িয়ে দিচ্ছি না। ঠাণ্ডা হাওয়া বেশি লাগলে শরীরের প্রতিরোধ শক্তি কমে যেতে পারে। সুতরাং সর্দি লাগা ছাড়া যে কোন রোগই ধরে যেতে পারে। এটা আবার নির্ভর করে এক একজনের জন্মগত সহনশক্তির উপর। বহুলোক আছেন শীতকালেও রাত্রিবেলায় ঠাণ্ডা জলে চান করেন। কিন্তু সকলে তা পারবেনও না, সহ্যও হবে না। আবার কারো এমন শরীর ঠাণ্ডা মোটে সহ্য করতে পারে না। সে সব অবস্থায় বিশেষভাবে সাবধান হওয়া উচিত। তাদের পক্ষে শীতকালে একটু গরম জল মিশিয়ে চান করা নিরাপদ। নতুবা সারা বছর ঠাণ্ডা জলে চান করাই স্বাস্থ্যকর। বন্ধ ঘরে এক সঙ্গে বেশি লোক শুলে হাওয়াবাহিত জীবাণুর রোগ হওয়া সম্ভাবনা থাকে। ছেলেমেয়েদের খোলা জায়গায় ব্যায়াম অথবা খেলাধূলা করা বায়ু বাহিত রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। সর্দিজ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগীর কাছে ছোট ছেলেমেয়েদের না থাকাই ভাল।

25A নিমতলাঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-6

ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ কেন হয়?

সাখাওয়াৎ ওসমান

আমরা প্রায় লক্ষ্য করি টেলিভিশনের পর্দায় মাঝে মাঝে সাদা ভাব দেখা যায় কিংবা অস্পষ্ট কথা বা ছবি কাঁপতে থাকে। ছবি কাঁপা, ছবি অস্পষ্ট বা সাদা ভাব এ সমস্ত কিছুকেই 'ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ' বলে। নয়েজ শব্দের বাংলা অর্থ গোলমাল।

রেডিওর কথাই ধরি, দূর দেশের কোন অনুষ্ঠান শুনছি, কিন্তু শব্দ হচ্ছে না। নানান শব্দ এক সঙ্গে নানান উপায়ে উচ্চারিত হচ্ছে বা শুনতে পাচ্ছি। তখন নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে। আর এ সব গোলমালের পেছনে রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ।

বৈদ্যুতিক পরিবাহক এবং ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির খুচরা অংশের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ঘন ঘন ও অনিয়মিত পরিবর্তনের জন্যে সার্কিটে এক প্রকার ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ বা বৈদ্যুতিক গোলমালের সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্রপাতিতে সামান্য কিছু না কিছু এ ধরনের নয়েজ হয়েই থাকে।

ফ্রিকয়েন্সিতে হলে তা স্পীকারের সাহায্যে শব্দে রূপান্তরিত করলে শাব্দিক নয়েজ হয়। গ্রাহকযন্ত্র চালু করে কোন কেন্দ্র না ধরেও আমরা যে শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পাই তা কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল নয়েজেরই শাব্দিক রূপ।

আজকাল অবশ্য শাব্দিক নয়েজ বুঝবার জন্যেও বৈদ্যুতিক উপায় অবলম্বন করা হয়। মাইক্রোফোনের পিকআপ দিয়ে শব্দ গ্রহণ করে সেই শব্দ বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে তা অসিলোসকোপে দেখা যেতে পারে। অত্যন্ত উন্নতমানের ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের জন্যেই এ ধরনের পরিমাপকার্য সম্ভব হয়েছে।

শুধু টেলিভিশন রেডিও কেন, টেলিগ্রাফ র‍্যাডার ইত্যাদিতেও নয়েজের আঁচড় আছেই। আর টেলিগ্রাফ র‍্যাডারে নয়েজ বেশি থাকলে বাইরের সংকেত বা সংবাদ ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

নয়েজ সম্পর্কে বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ারদের অনেক পড়াশোনা ও গবেষণার পরেও অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে। নয়েজ আবার কয়েক ধরনের আছে। যেমন ঃ

থারমাল নয়েজ।
ফ্লিকার নয়েজ।
শট নয়েজ।
জেনারেশন রিকমবিনেশান নয়েজ।
এটমোসফেরিক নয়েজ।
বার খাউসেল নয়েজ।
ইলেকট্রন রশ্মির নয়েজ।

উল্লেখিত নয়েজ ছাড়াও আরও কয়েকপ্রকার ননর‍্যানডম নয়েজ রয়েছে। যেমন —হাস, রো, সাই—ক্রফনিক্স, হাওয়েল মোটর বোটিং ইত্যাদি। তবে উল্লেখিত প্রথম কয়েকটা নয়েজ নিয়েই আলোচনা করবো।

থারমাল নয়েজ ঃ মুক্ত ইলেকট্রনের জন্যই পরিবাহকে বিদ্যুৎ প্রবাহ সম্ভব। সুপরিবাহকে এইরূপ অসংখ্য মুক্ত ইলেকট্রন সর্বদা ঘুরে বেড়ায়। 1906 সালে আইনস্টাইন ইলেকট্রনের এ ধরনের গতিবিধির বিষয় সঠিক ধারণা দেন। পরিবাহকে বৈদ্যুতিক চাপ ছাড়াই ইলেকট্রনসমূহ মুক্তভাবে ঘোরাফেরার সময় পরমাণুতে ধাক্কা খায়, ধাক্কায় ইলেকট্রনের বেগ ও দিক পরিবর্তন হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। পরিবাহকে ইলেকট্রনের অনিয়মিত ঘোরাফেরার জন্যে সার্কিটে থারমাল নয়েজ সৃষ্টি হয়।

থারমাল নয়েজকে সার্কিট নয়েজ, রেজিস্ট্যান্স নয়েজ, কিংবা জনসন নয়েজ বলা হয়ে থাকে।

ফ্লিকার নয়েজ ঃ শট নয়েজ ছাড়াও টিউবে ফ্লিকার নামে একপ্রকার নয়েজ হয়ে থাকে। এই নয়েজ শ্রাব্য এবং আধাশ্রাব্য ফ্রিকয়েন্সিতে শট নয়েজের চেয়ে অনেক বড় আকারে দেখা দেয়। শট্‌কি (Scottky) প্রথমে এই নয়েজকে ফ্লিকার নয়েজ বলে আখ্যায়িত করেন।

বাষ্পীয়ভবন, ডিফিউশান, রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং আরও কতগুলি কারণে ক্যাথোডগাত্রের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই পরিবর্তন আবার ক্যাথোডগাত্রের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের জন্য ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন নিষ্ক্রমনের পরিবর্তন হয় ও টিউবের ভিতর বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটে। উচ্চ ফ্রিকয়েন্সিতে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে। এবং এই ধরনের নয়েজযুক্ত সার্কিট দিয়ে নিম্ন ফ্রিকয়েন্সিতে কাজ করতে মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অবশ্য টিউবের ক্যাথোড বিশেষ কায়দায় তৈরী করে এ ধরনের নয়েজ কমানো যেতে পারে। ফ্লিকার নয়েজ আবার আক্রেস নয়েজ নামেও পরিচিত।

শট নয়েজ ঃ ভ্যাকুয়াম টিউবে শট নয়েজ বেশি হয়ে থাকে। ইলেকট্রনগুলি টিউবের ক্যাথোড থেকে বার হয়ে প্লেটে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু এ সব ইলেকট্রন টিউবের ক্যাথোড থেকে সমানভাবে বার হয় না। কোন সময় বেশি আবার কোন সময় কম ঠিক এ নিয়মেই ক্যাথোড থেকে বার হয়।

(Shot) এর অর্থ হলো 'গুলি'। টিউবে ইলেকট্রন-সমূহ ছোট ছোট গুলির মতো প্লেটে গিয়ে হাজির হয়। এ সমস্ত ইলেকট্রন সমানভাবে প্লেটে না গেলে টিউবের ভিতর অনিয়মিত বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং টিউবে শট নয়েজ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমন কি সেমিকণ্ডাক্টর দ্বারা তৈরী ডায়েড এবং ট্রানজিস্টারেও শট নয়েজ হতে পারে।

অনেক অংশ বিশিষ্ট টিউব যেমন ট্রায়েড, টেট্রড ও পেন্টোডে ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন নির্গমনের পর ইলেকট্রন সমূহ বিভিন্ন ইলেকট্রোডে বিভক্ত হতে পারে। এই ধরনের অবস্থার জন্যে উদ্ভূত নয়েজকে পার্টিশন নয়েজ বলে। এমন কি অনেক অংশ বিশিষ্ট টিউব ইনডিউসড্ গ্রীড নয়েজ বলে।

জেনারেশন রিকমবিনেশান নয়েজ ঃ সাধারণত এই নয়েজ সেমিকণ্ডাক্টরে বিভিন্ন অবস্থার তারতম্য হেতু ইলেকট্রন ও হোল পয়দা হয়ে থাকে। আবার অবস্থাবিশেষে ইলেকট্রন ও হোল উদ্ভব হয় কিংবা অনেক সময় বিদ্যুৎ পরিবাহক কণা বিশেষ অবস্থায় আটকাও পড়ে যায়— যার জন্যে সেমিকণ্ডাক্টরে বিদ্যুৎ পরিবাহক কণিকার ঘনত্বের পরিবর্তন হয়ে এই ধরনের নয়েজের সৃষ্টি হয়।

এটমোসফেরিক নয়েজ ঃ র‍্যাডার, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদি যে সব যন্ত্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরে থাকে সেই সব যন্ত্রে অনেক সময় কতগুলি অবাঞ্ছিত বৈদ্যুতিক সংকেত ধরা পড়ে। এই সমস্ত সংকেত মাঝে মাঝে এমন বেশি হয় যে মূল সংকেত এদের মধ্যে হারিয়ে যায়। বিজলি চমকানো, আকাশে মেঘে মেঘে ঘর্ষণ এবং আউটার গ্যালাক্সি থেকে এই সব সংকেত আসে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালীন সময়ে এই নয়েজের প্রকোপ বেশি।

বারখাউসেন নয়েজ ঃ বিজ্ঞানীদের মতে যখন চুম্বকের শক্তিরেখা কোন কয়েলকে ছেদ করে এবং চুম্বক বা কয়েল যে কোন একটি চলমান থাকে তা হলে কয়েল ভোল্টেজ সৃষ্টি হয়। যদি চুম্বকের চুম্বকীয় শক্তির অনবরত পরিবর্তন হয় তবে শক্তিরেখাগুলি এলোমেলোভাবে কয়েলকে ছেদ করে এবং নয়েজ ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়। এইভাবে সার্কিটে যে এলোমেলো বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে বারখাউসেন নয়েজ বলে।

যে সমস্ত বেতার যন্ত্রে লুপ-এনটেনা এবং লোহার শলাকা বিশিষ্ট পাওয়ার ট্রান্সফরমার আছে সে সমস্ত যন্ত্রে এ নয়েজের সৃষ্টি বেশি হয়।

ইলেকট্রন রশ্মির নয়েজ ঃ ক্যাথোড থেকে অনিয়মিত ইলেকট্রন নির্গমন এবং ইলেকট্রনের বিভিন্ন গতির দরুন এ নয়েজের সৃষ্টি হয়।

হাম নয়েজ ঃ পাওয়ার লাইন ফ্রিকয়েন্সি এবং তার হারমনিকসগুলি যন্ত্রপাতিতে হাম নয়েজের সৃষ্টি করে।

রো নয়েজ ঃ যান্ত্রিক নড়াচড়ার জন্য বৈদ্যুতিক সার্কিটে অনেক স্থলে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে এই নয়েজের সৃষ্টি হয়।

মোটর বোটিং নয়েজ ঃ রেডিও বা টেলিভিশনে মাঝে মধ্যে কট, কট, শব্দের সৃষ্টি হয়। সাধারণত মোটর বোটিং নয়েজের জন্যেই এই শব্দের সৃষ্টি। বিশেষ কতগুলি সাবধানতা অবলম্বন করেই এ সমস্ত নয়েজকে কমিয়ে আনা সম্ভব।

ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ শুধু আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি করে তা নয়, মাঝে মধ্যে এই ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

নয়েজ পরিমাপের দ্বারা আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। যন্ত্রপাতির নয়েজের বৈশিষ্ট্য জানতে পারলে আমরা বুঝতে পারি যে, সেই যন্ত্র দিয়ে কি পরিমাণ বৈদ্যুতিক সংকেত মাপা বা বাড়ানো সম্ভব। নয়েজের পরিমাণ জানা থাকলে আমরা যন্ত্রের সুবিধাজনক কার্য করার পরিমাণও জানতে পারি।

ইলেকট্রিক্যাল পরিমাপে নয়েজকে অনেক সময় টেস্ট সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এমন কি ট্রানজিস্টারের আয়ুকাল সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

এতেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, নয়েজ শুধু আমাদের বিরক্তি আর ক্ষতিই করে না, আমাদের উপকারও করে বা উপকারের কাজে লাগে।

102, নিউ এয়ার পোর্ট রোড (3তলা), ঢাকা-16,বাংলাদেশ।

জীবন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ (10)

তারকমোহন দাস

জীবজগৎ সম্পর্কে কিছু জানতে হলে প্রথমেই উদ্ভিদ বা প্রাণীটিকে নিজের চোখে বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তার বৈশিষ্ট্যগুলি সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে হবে—ঐ শ্রেণীর অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর সঙ্গে মিল কোথায়, তফাৎই বা কোথায়। সম্ভব হলে তার বিভিন্ন অংশের ছবি আঁকবে এবং তোমার পরীক্ষার বিবরণ লিপিবদ্ধ করবে। তোমার এই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রথমেই তোমার পক্ষে যা জানা সম্ভব তা হলো এই উদ্ভিদ বা প্রাণীটি কোন্ শ্রেণীর। পৃথিবীতে যতরকম উদ্ভিদ আছে তা দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়—সপুষ্পক উদ্ভিদ ও অপুষ্পক উদ্ভিদ। যেসব উদ্ভিদের দেহে ফুল ফোটে এবং বীজের সাহায্যে বংশ বিস্তৃত হয় তাদের বলা হয় সপুষ্পক উদ্ভিদ ; যেমন—আম, কাঁঠাল, ধান, ভুট্টা, মটর, বট, অশ্বত্থ, তাল, নারকোল, সাইকাস্, পাইন ইত্যাদি। কিন্তু পৃথিবীতে আরো বহু রকম উদ্ভিদ আছে যাদের দেহে ফুল ফোটে না, বীজ হয় না, 'স্পোর' নামক একরকম সূক্ষ্ম বংশবিস্তারকারী কোষের সাহায্যে বংশবিস্তার করে থাকে, তাদের বলা হয় অপুষ্পক উদ্ভিদ ; যেমন—নানারকম শ্যাওলা, নানারকম ব্যাঙের ছাতা, মস, ফার্ন ও ব্যাকটিরিয়া (ব্যাকটিরিয়াও একরকম উদ্ভিদ)।

কিছু সপুষ্পক উদ্ভিদ আছে যাদের দেহে ফুল সচরাচর দেখা যায় না, যেমন—বিভিন্ন জাতীয় বাঁশ। কিন্তু বহু বছর পরে বাঁশে ফুল ফোটে, তারপর সমস্ত বাঁশঝাড়টাই শুকিয়ে মরে যায়। কিছু উদ্ভিদের ফুল বাইরে থেকে দেখা যায় না, যেমন—ডুমুর, বট, কাঁঠাল, আনারস। এদের ফলগুলি একটি গোটা পুষ্পস্তবক থেকে তৈরী হয়। একটি ছোট ডুমুর বা এঁচোড় একটি পুষ্পস্তবক ছাড়া আর কিছুই নয়, সেটা ফাটলেই তার ভেতরে অজস্র ছোট ছোট ফুল দেখা যায়। এগুলি তোমাদের ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে। প্রত্যেক গাছের ফুল কিরকম দেখতে তা চিনতে হবে, ফল, বীজ ও গাছের পাতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবে।

সপুষ্পক উদ্ভিদদের আবার দু ভাগে ভাগ করা হয়, আবৃতবীজী বা গুপ্তবীজী (Angiosperms) ও ব্যক্তজীবী বা নগ্নবীজী (Gymnosperms) উদ্ভিদ। আম, কাঁঠাল, তাল, নারকোল, ধান. মটর প্রভৃতির বীজ ফলের মধ্যে গোপন থাকে, ফলের খোসা ছাড়ালেই তবে বীজটা দেখা যায়, তাই এদের বলা হয় আবৃতবীজী বা গুপ্তবীজী উদ্ভিদ। কিন্তু কিছু উদ্ভিদ আছে যাদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে না, বাইরে খোলা অবস্থায় থাকে। বাইরে থেকেই ঐ বীজ দেখা যায়, এদের বলা হয় ব্যক্তবীজী বা নগ্নবীজী উদ্ভিদ ; যেমন পাইন, সাইকাস্, নিটাম, অরোকেরিয়া ইত্যাদি। এদের ফুল জটিলতাবর্জিত, শুধু গর্ভপত্র ও পুংকেশর নিয়ে গঠিত, ঐগুলি একটি কোন (Cone) বা শঙ্কুর আকারে সাজানো থাকে। আমাদের হিমালয় অঞ্চলে এই সব উদ্ভিদের বিশেষ আধিপত্য দেখা যায়। দেওদার (সেড্রাস দেওদারা) বলতে যে গাছটিকে বোঝায় সেটি এই ব্যক্তজীবী গোষ্ঠীর উদ্ভিদ, শীতল পার্বত্য অঞ্চলে হয়। কিন্তু আমাদের পরিচিত দেবদারু গাছ যার লম্বা লম্বা ঢেউ খেলানো পাতায় গেট তৈরী করি তা আবৃতবীজী উদ্ভিদ। অর্থাৎ দেওদার ও দেবদারু দুটি সম্পূর্ণ আলাদা গোষ্ঠীর বৃক্ষ। অনেকে দুটিকে একই গাছ মনে করেন, সেটা ঠিক নয়।

অতিদীর্ঘ আয়ুষ্কালের অধিকারী আমেরিকার রেড-উড ট্রি (সেকোয়া জাইঁগার্নাসিয়া) এই ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাদের কারো কারো বয়স দুই থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আগেই এই সব রেড-উড ট্রি জন্মেছিল এবং আজও তারা বেঁচে আছে। সমুদ্রবাসী প্রাণী নীল-তিমিকে বলা হয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাণী, দৈর্ঘ্যে প্রায় 90 ফুট, ওজনে 160 টনের মতো। অতীতে যে সব ডাইনোসরাস গোষ্ঠীর প্রাণীরা অবলুপ্ত হয়ে গেছে তারাও এত বড় ছিল না। কিন্তু রেড-উড ট্রির দৈর্ঘ্য 300 ফুটের বেশি। দীর্ঘতম বৃক্ষটির উচ্চতা 364 ফুট এবং সবচেয়ে বেশি ওজনের বৃক্ষটির ওজন 6167 টন, অর্থাৎ একটা গাছের কাঠ থেকেই একটা ছোটখাট সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হতে পারে। রেড-উড ট্রিকে তাই বলা হয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অতিকায় জীবিত জীব এবং সবচেয়ে বৃদ্ধ জীবও বটে, সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে। উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে

এদের ঘিরে একটি জাতীয় অরণ্য (Red wood forest) গড়ে তোলা হয়েছে।

রেড-উড ট্রি

আমাদের চোখের সামনে যে সব গাছপালা বেশি দেখা যায়, যেমন ছোলা, মটর, লাউ, কুমড়া, আম, জাম, তেঁতুল, ধান, ঘাস, তাল, নারকোল এরা সবই আবৃতবীজী উদ্ভিদ, কেননা এদের বীজ ফলের মধ্যে গোপন থাকে। এরা দুটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ ও একবীজপত্রী উদ্ভিদ। ছোলা, মটর, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বীজের খোসা যদি ছাড়ানো যায়, তা হলে সেখানে দেখা যাবে দুটি বীজ-পত্র আছে। মাটিতে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হলে বহুক্ষেত্রে এই দুটি বীজপত্রই প্রথম দটি পাতায় পরিণত হয়। এই ধরনের উদ্ভিদকে বলা হয় দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলি তোমরা খুব ভাল করে লক্ষ্য করবে। যেমন এদের একটি প্রধান মূল থাকে যা থেকে পরে অনেক শাখাপ্রশাখা বের হয়। এদের পাতাগুলির গায়ে যে শিরা-উপশিরা থাকে তা জালের আকারে ছড়িয়ে থাকে (জাল শিরাবিন্যাস) এবং এরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিধিতেও বাড়ে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের অজস্র উদাহরণ তোমাদের চোখের সামনেই ছড়িয়ে আছে। যেমন—আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, বট, অশ্বত্থ, জবা, গোলাপ, পুঁই ইত্যাদি।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হলো এদের বীজের খোসা ছাড়ালে দেখা যাবে একটিমাত্র বীজপত্র আছে, যার নাম স্কুটেলাম (Scutellum)। ধান, গম, ভুট্টা, ঘাস, কলা, বাঁশ. তাল, নারকোল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতি এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ। একবীজপত্রী উদ্ভিদের আরো বৈশিষ্ট্য হলো এদের প্রধান মূল থাকে না, সে জায়গায় অসংখ্য সরু সরু মূল বের হয়—তাদের গুচ্ছ মূল বলে। এদের পাতার গায়ে শিরাগুলি সমান্তরালভাবে থাকে (সমান্তরাল শিরাবিন্যাস)। এদের শাখা-প্রশাখা বের হয় না এবং এরা লম্বায় শুধু বাড়ে, পরিধিতে বাড়ে না (কয়েকটি দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া)।

সুতরাং একটি গাছ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তা জানতে হলে গাছে ফুল হয় কিনা. বীজ ফলের মধ্যে আছে না মুক্ত অবস্থায় আছে, বীজের মধ্যে বীজপত্রের সংখ্যা একটি না দুইটি, গাছে গুচ্ছমূল আছে না একটি দীর্ঘ প্রধান মূল আছে, পাতার শিরাবিন্যাস কিরকম,—জাল শিরাবিন্যাস, না সমান্তরাল শিরাবিন্যাস? এগুলি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে সহজেই সঠিক-ভাবে সপুষ্পক-অপুষ্পক, গুপ্তবীজী-নগ্নবীজী, ও একবীজ-পত্রী-দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদশ্রেণী সনাক্ত করা সম্ভব।

এই গাছ চেনার কাজে পাতার শিরাবিন্যাস বিশেষ-ভাবে সাহায্য করে থাকে। বীজ এবং বীজপত্র বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু এই শিরাবিন্যাস সঠিকভাবে চিনিয়ে দেয়—উদ্ভিদটি একবীজপত্রী অথবা দ্বিবীজপত্রী শ্রেণীর অন্তর্গত কিনা।

অপুষ্পক উদ্ভিদদেরও কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন থ্যালোফাইটা (Thallophyta), ব্রায়ো-ফাইটা (Bryophyta) ও টেরিডোফাইটা (Pterido-phyta)। শেওলা বা শৈবালের (Algae) নাম আমরা সবাই শুনেছি। বদ্ধ জলাশয়ে বা অপরিষ্কার কলতলার মেঝেতে সবুজ রঙের পিচ্ছিল আবরণের সৃষ্টি করে এরা। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এদের দেহ একটি বা অনেকগুলি কোষের সমন্বয়ে তৈরী। এদের কোন কাণ্ড বা শিকড় নেই। এই ধরনের দেহখণ্ডকে সমাঙ্গদেহ বা থ্যালাস (Thallus) বলে। সেইজন্য এদের গোষ্ঠীর নাম থ্যালোফাইটা। কারা, স্পাইরোগাইরা প্রভৃতি

শৈবাল আমাদের পুকুরের মিঠাজলে জন্মায়। সমুদ্রের বুকেও ডায়াটম, কেলপ, ফিউকাস্ প্রভৃতি প্রচুর শৈবাল বসবাস করে। তারা যে দেহের মধ্যে জৈব খাদ্য তৈরী করে মূলত তারই ওপর নির্ভর করে সমুদ্রের বিশাল প্রাণী-জগৎ বেঁচে আছে।

ছত্রাক বা ব্যাঙের ছাতাও (Fungi) আর একরকম সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ। এদেরও শিকড়, কাণ্ড ও পাতা নেই। শৈবালের সঙ্গে প্রধান পার্থক্য হলো ছত্রাকের দেহে কোন সবুজকণা (Chlorophyll) নেই, তাই এদের দেহের রং ঘোলাটে সাদা। এরা অন্যান্য উদ্ভিদের মতো নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরী করে নিতে পারে না। এরা পচা রুটি, ফল, গোবর, অন্যান্য উদ্ভিদ এমন কি মানুষের ত্বকের ওপরও জন্মায় এবং সেইখান থেকেই জৈব খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। তাই এদের মৃতজীবী (Saprophytes) বলে। এরা বাইরে থেকে তৈরী খাদ্য সংগ্রহ করে বলে এদের পরভোজীও (Heterophytes) বলে। অন্যান্য সবুজ উদ্ভিদকে বলা হয় স্বভোজী (Autophytes)। এই ছত্রাক শ্রেণীর অনেক উদ্ভিদ নানারকম রোগ সৃষ্টি করে। ঈস্ট শ্রেণীর ছত্রাক খেজুর ও তালের রস থেকে তাড়ি তৈরী করে। পেনিসিলিয়াম নামক ছত্রাকের দেহ থেকে মূল্যবান অ্যাণ্টিবায়োটিক পেনিসিলিন তৈরী হয়।

এই প্রসঙ্গে সমাঙ্গদেহী আরো দুটি বিচিত্র উদ্ভিদ-গোষ্ঠীর নাম করা যেতে পারে। তারা হলো ব্যাকটিরিয়া ও ও লাইকেন। ব্যাকটিরিয়া একটি এককোষী জীব, এরা উদ্ভিদ-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। কেননা এদের কোষের চারিপাশে একটি কোষপ্রাচীর আছে, প্রাণীদের যা নেই। তা ছাড়া কোনো কোনো জাতের ব্যাকটিরিয়া নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে, প্রাণীরা যা পারে না। দুশো থেকে তিনশো কোটি বছর আগে এই ধরনের জীবরাই পৃথিবীতে প্রথম দিকে এসেছিল। ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, টিটেনাস্ প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এক জাতের ব্যাকটিরিয়া আমাদের অন্ত্রের মধ্যে ভিটামিন B_{12} তৈরী করে, যা না হলে আমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হত না। ব্যাকটিরিয়া এবং আরও কয়েক প্রকার সূক্ষ্ম জীবাণু, পৃথিবীর যাবতীয় জৈব পদার্থকে ভেঙে অজৈব উপাদানে পরিণত করে, যার ফলে পৃথিবীর অজৈব উপাদানগুলি জীবেরা পুনরায় ব্যবহার করতে সক্ষম হয় এবং সকল জীবের জীবন ধারণ সম্ভব হয়।

পরস্পর নির্ভরতার আর একটি অপূর্ব উদাহরণ দেখা যায় লাইকেনদের মধ্যে। শুষ্ক পাথরের বুকে অথবা গাছের গুঁড়ির ওপর ধূসর রঙের চাকা চাকা দাগ দেখা যায়, এগুলি লাইকেন। লাইকেনের দেহ ছত্রাক ও শ্যাওলার মিলনে গঠিত। শ্যাওলা অজৈব উপাদান থেকে জৈব খাদ্য তৈরী করে ছত্রাককে বাঁচিয়ে রাখে, ছত্রাক রাত্রির শিশিরবিন্দু সংগ্রহ করে শেওলাকে শুকিয়ে যেতে দেয় না। এইভাবে পরস্পরের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েই শুষ্ক পাথরের বুকে এরা উদ্ভিদের প্রাথমিক উপনিবেশ স্থাপন করে। এরা পাথর ক্ষয় করে ও নিজেদের দেহজাত জৈব পদার্থ সঞ্চিত করে ধীরে ধীরে যে মৃত্তিকাস্তর গড়ে তোলে তারই ওপর অন্যান্য উদ্ভিদরা ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করে একদিন সেখানে অরণ্য গড়ে তোলে।

বর্ষাকালে পুরানো ভাঙা পাঁচিলের গায়ে ভেলভেটের মতো নরম সবুজ আস্তরণ বিছিয়ে রাখে মস্ জাতীয় উদ্ভিদরা। এদের দেহেও ফুল ফোটে না, তবে সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদগোষ্ঠী থেকে এরা স্বতন্ত্র। কেননা এদের পাতা ও কাণ্ড আছে, কিন্তু শিকড় হয় না, তার বদলে সূতোর মতো রাইজয়েড্ আছে। মসের ডগা থেকে সরু ডাঁটার মতো অঙ্গের মাথায় এদের রেণুস্থলী বা ক্যাপসুল তৈরী হয়। এই ক্যাপসুল দেখেই মস্ সনাক্ত করা যায়। মস্ জাতীয় উদ্ভিদদের ব্রায়োফাইটা বলে। রিকসিয়া, মারকেন্সিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের কিন্তু মসের মতো কোন ক্যাপসুল হয় না। এদের সবুজ দেহ মাটির ওপর বিছিয়ে থাকে ফিতার মতো, এদেরও রাইজয়েড্ আছে।

আমাদের পরিচিত নানারকম ফার্ন ও শুষনি শাকের কোন ফুল হয় না। তাই তারা অপুষ্পক উদ্ভিদ। এরা টেরিডোফাইটা বা ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এদের শিকড়, কাণ্ড ও পাতা আছে। পাতার তলার থলির মতো অঙ্গ দেখা যায়, তাকে বলে রেণুস্থলী বা স্পোরাঞ্জিয়াম-যার মধ্যে স্পোর থাকে। এই স্পোরের সাহায্যে এরা বংশ বিস্তার করে। ফার্নের কচি পাতা কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। এই কুণ্ডলী পাকানো পাতা ও স্পোরাঞ্জিয়াম দেখে ফার্ন গাছ চেনা যায়। সিলাজিনেলা, টেরিস্, লাইকোপোডিয়াম প্রভৃতি উদ্ভিদ এই ফার্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই সমস্ত অপুষ্পক উদ্ভিদ—ব্যাকটিরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক, মস্ ও ফার্নদের মনে করা করা হয় আদি যুগে প্রথমে আবির্ভূত হয়েছিল। তার পরে সপুষ্পক উদ্ভিদরা এসেছে। অতীতে অনেক ফার্নের দেহ অতিকায় ছিল। তাদের দেহ মাটির তলায় চাপা পড়েই অধিকাংশ কয়লাস্তরের সৃষ্টি হয়েছে।

---

35 বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলি-19

1983'র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য

জীবনবিজ্ঞান ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দিনোজকুমার দে

1. শ্বসন কাহাকে বলে? শ্বসন কত প্রকার ও কি কি? শ্বসন ও শ্বাসকার্যের মধ্যে পার্থক্য কি? উন্নত উদ্ভিদে কিভাবে অক্সিজেনের আদান-প্রদান হইয়া থাকে? কিভাবে মানুষের শ্বাসকার্য চলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। জীবদেহে শ্বসনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। শ্বসন ও দহন, অবাত শ্বসন ও সন্ধান প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?

2. (a) পরিপোষণ বলিতে কি বুঝ? পরিপোষণের উপর ভিত্তি করিয়া উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা দাও। মৌলিক উপাদান ও স্বল্প মৌলিক উপাদানের মধ্যে পার্থক্য কি?

(b) পুষ্টি কাহাকে বলে? পুষ্টির পর্যায় কয়টি ও কি কি? সুষম খাদ্য কাহাকে বলে? ভিটামিন কি? ভিটামিন A, D, E, K ও C-এর উৎস ও অভাবজনিত রোগের লক্ষণ কি কি? প্রোটিন ও ফ্যাটের মধ্যে পার্থক্য কি? অ্যাপো ও কো-এনজাইম বলিতে কি বুঝ? B. M. R কি? পরিপাক ও আত্তীকরণ-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

3. (a) সংবহন কাহাকে বলে? সংবহনের উদ্দেশ্য কি? বদ্ধ ও মুক্ত সংবহন বলিতে কি বুঝ? রক্ত কি? কি কি উপাদান দ্বারা উহা গঠিত? রক্তের সাধারণ কাজগুলি কি কি? কিসের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া রক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়? সার্বজনীন দাতা ও গ্রহীতা বলিতে কি বুঝ? অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির মধ্যে পার্থক্য কি? রক্ত-তঞ্চন কিভাবে ঘটে? হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিনের মধ্যে পার্থক্য কি?

(b) লসিকা বলিতে কি বুঝ? সিস্টেমিক ও পোর্টাল সংবহন কাহাকে বলে? মানুষের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের ছবি আঁকিয়া রক্তসংবহনের বর্ণনা দাও।

4. (a) চলন ও গমনের মধ্যে পার্থক্য কি? গমনের উদ্দেশ্য কি? উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের বর্ণনা দাও। ট্যাকটিক গমন কি? প্রোটোপ্লাজমের চলনকে কি বলে? গমনে সক্ষম দুটি উদ্ভিদ ও গমনে অক্ষম দুটি প্রাণীর নাম কর।

(b) চিত্রসহ অ্যামিবা, মাছ, কেঁচো ও আরশোলার গমনপদ্ধতি বর্ণনা কর। পেশীর ক্লান্তি বলিতে কি বুঝ?

5. (a) রেচন কাহাকে বলে? উদ্ভিদদেহ হইতে রেচন পদার্থ নিষ্কাশনের পদ্ধতিগুলি কি? উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলির নাম লিখ এবং তাহাদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব উল্লেখ কর। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে রেচনের পার্থক্য কি কি?

(b) আরশোলা ও কেঁচোর রেচন বর্ণনা কর। মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রধান রেচন অঙ্গ কি? উহার গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

6. (a) জীবাণু কাহাদের বলে? ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণী বিভাগ কর। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে ঘটে এমন দুটি রোগের নাম লিখ। ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ কর। ভাইরাস কাহাকে বলে? ভাইরাসকে জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী বলা হয় কেন? ভাইরাস ঘটিত কয়েকটি রোগের নাম লিখ। দুটি উপকারী ছত্রাক ও দুটি অপকারী প্রোটোজোয়ার নাম লিখ। T. M. V কি? পাস্তুরাইজেশন কাহাকে বলে?

7. (a) স্নায়ুতন্ত্র কাহাকে বলে? মানুষের স্নায়ুতন্ত্র কি কি অংশ দ্বারা গঠিত? স্নায়ুতন্ত্রের একক কি? সাইন্যাপস কি? প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাহাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণ দাও। প্রতিবর্তচক্র বলিতে কি বুঝ? চিত্রসহ মানুষের মস্তিষ্কের গঠন ও প্রতিটি অংশের কাজ উল্লেখ কর।

(b) চিত্রসহ মানুষের চোখের অন্তর্গঠনের বর্ণনা দাও এবং প্রতিটি অংশের কাজ উল্লেখ কর। অন্ধ-বিন্দু ও পীত-বিন্দুর মধ্যে পার্থক্য কি? অন্তর্কর্ণে অবস্থিত অস্থি তিনটির নাম কি? ককলিয়া কোথায় অবস্থিত? স্বাদ-কোরক কি? মানুষের স্পর্শেন্দ্রিয় কোন্‌টি?

8. (a) পিটুইটারী গ্রন্থিকে কেন 'প্রভুগ্রন্থি' বলা হয়? থাইরক্সিন, সোমাটোট্রপিক, ইনসুলিন, অ্যাড্রিনালিন কোন্ কোন্ গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ হয় এবং মানবদেহে এই গ্রন্থিগুলির কাজ কি? হরমোন ও উৎসেচকের মধ্যে পার্থক্য কি? স্থানীয় হরমোন কাহাকে বলে? জরুরীকালীন হরমোন কাহাকে বলে?

(b) হরমোন কাকে বলে? হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলা হয় কেন? অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলিতে কি বুঝ? বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ হরমোনের উৎপত্তিস্থল ও কার্যকারিতা বর্ণনা কর। কৃষিকার্যে হরমোনের ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ কর। পার্থেনোকার্পি কি?

9. (a) ক্রোমোজোম কি ? হ্যাপলয়েড ও ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম বলিতে কি বুঝ ? জিন কি ? সেন্ট্রোমিয়ার কি ?

(b) মাইটোটিক কোষ-বিভাজন কাহাকে বলে ? মাইটোটিক কোষ-বিভাজনকে সম-বিভাজন ও মেয়োটিক কোষ-বিভাজনকে হ্রাস-বিভাজন বলা হয় কেন ? মাইটোটিক ও মেয়োটিক কোষ বিভাজনের তাৎপর্য কি ? , মাইটোটিক ও মেয়োটিক কোষ-বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য কি ?

10. বংশগতি কাহাকে বলে ? বংশগতির জনক কে ? মেণ্ডেলের প্রথম দুটি সূত্র কি কি ? এক সংকর জননের মাধ্যমে ঐ সূত্র ব্যাখ্যা কর। ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপ অনুপাত বলিতে কি বুঝ ? হোমোজাইগোট ও হেটেরো জাইগোট বলিতে কি বুঝ ? কৃষির উন্নতিতে সংকরায়ণ পদ্ধতির ভূমিকা আলোচনা কর।

11. (a) বৃদ্ধি কাহাকে বলে ? উদ্ভিদবৃদ্ধি ও প্রাণি-বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্যগুলি কি কি ? মুখ্য বৃদ্ধিকাল কাহাকে বলে ? বার্ষিক বলয় কি ? উদ্ভিদবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(b) জনন কাহাকে বলে ? জননের প্রয়োজনীয়তা কি ? একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক-পদ্ধতির চিত্রসহ বিবরণ দাও।

12. ফসিল কি ? লুপ্তপ্রায় অঙ্গের সংজ্ঞা দাও। সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কি ? উদাহরণ সহ ল্যামার্কের তত্ত্ব দুইটি ব্যাখ্যা কর। চার্লস ডারউইনের অনুসরণে বিবর্তনের সূত্র ব্যাখ্যা কর। দুটি সংযোগকারী প্রাণীর উদাহরণ দাও। পরিব্যক্তি কাহাকে বলে ? পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছিল ?

13. অভিযোজন কথাটির অর্থ কি ? অভিযোজনের উদ্দেশ্য কি ? নিম্নলিখিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর অভিযোজন-গুলি কি কি ? (a) পদ্ম, (b) সুন্দরী, (c) রুই মাছ (d) পায়রা। দ্বি-অভিযোজন হইয়াছে এমন একটি প্রাণীর নাম কর। শ্বাসমূল কি ?

14. 'ইকোসিস্টেম' বলিতে কি বুঝ ? ইকো-সিস্টেমের উপাদানগুলি কি কি ? খাদ্য, খাদক ও বিয়োজক বলিতে কি বুঝ ? ইকোসিস্টেমে উৎপাদক কাহারা ? বায়োমাস ও বায়োস্ফিয়ার বলিতে কি বুঝ ? বাস্তু সংস্থানিক পিরামিড ও খাদ্যশৃঙ্খল কি ? ইকো-সিস্টেমের মধ্যে শক্তিপ্রবাহ কিভাবে ঘটে ? একটি পুকুরের উদাহরণ দিয়া ইকোসিস্টেম সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

15. বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ কিভাবে ঠিক থাকে তাহা বুঝাইয়া দাও। জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র বলিতে কি বুঝ ? জীব ভূ-রাসায়নিক চক্রের তাৎপর্য কি ?

16. চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রতিটি অংশ চিহ্নিত কর ঃ—

(i) আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র (ii) মানুষের পৌষ্টিক-তন্ত্র (iii) মানুষের শ্বাসতন্ত্র (iv) উভচর হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ (v) মানুষের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ (vi) নেফ্রন (vii) নিউরোন (viii) পুরুষ ব্যাঙের মূত্র-জননতন্ত্র (ix) কর্ণের অন্তর্গঠন (x) চোখের অন্তর্গঠন (xi) একটি সম্পূর্ণ ফুল। (xii) মাইটোসিসের অ্যানাফেজ দশা।

17. পার্থক্য লিখ ঃ—

(i) সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাসকার্য (ii) অবাত শ্বসন ও সবাত শ্বসন (iii) পরিপাক ও আত্তীকরণ (iv) আস্রাবন ও ব্যাপন (v) হেপাটিক পোর্টাল ও রেনাল পোর্টাল (vi) রক্ত ও লসিকা (vii) জাইলেম ও ফ্লোয়েম (viii) মুক্ত ও বদ্ধ সংবহন (ix) মিস্টোল ও ডায়াস্টোল (x) ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলন (xi) মানুষের রক্ত ও ব্যাঙের রক্ত (xii) ম্যালপিজিয়ান টিউবিউল ও ম্যাল-পিজিয়ান করপাসল্ (xiii) ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস (xiv) সাইন্যাপস ও সাইন্যাপসিস (xv) কর্নিয়া ও কক্লিয়া (xvi) হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড কোষ (xvii) সংশ্লেষ ও নিষেক (xviii) প্রবল ও অপ্রবল গুণ (xix) পার্থেনোজেনোসিস ও পার্থেনোকার্পি (xx) উৎপাদক জীব ও খাদক জীব।

18. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ

(i) আলোক বিক্রিয়া (ii) উৎসেচক (iii) হলোজয়িক পুষ্টি (iv) মৌল বিপাক (v) রসের উৎস্রোত (vi) নেফ্রন (vii) শারীরবৃত্তীয়ভাবে শুষ্ক মৃত্তিকা (viii) হিউমাস মাটি (ix) ব্যাকটেরিওফাজ (x) ব্লাড-গ্রুপ 0 (xi) উপকারী ছত্রাক (xii) কোরকোদগম (xiii) প্রকারণ (xiv) অন্তর্বর্তী-প্রাণী (xv) অভয়ারণ্য (xvi) জোড় কলম।

19. নিম্নলিখিত বিজ্ঞানীগণ কি কারণে বিখ্যাত ঃ

(a) প্রিস্টলে (b) উইলিয়াম হার্ভে (c) ল্যাণ্ড স্টিনার (d) কুন্ (e) ফাঙ্ক্ (f) লিউয়েনহক (g) আয়ানোস্কি (h) আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (i) রবার্ট হুক (j) রবার্ট কক্ (k) আইভান পাভ্লভ (l) ট্যান্সলে (m) গ্রেগর মেণ্ডেল (n) লুই পাস্তুর (o) ল্যামার্ক (p) ডারউইন (q) ডি-ভ্রিস।

প্রফুল্লপ্রতাপ বিদ্যায়তন, কলি-54

লঘুতম : গ্যাস হাইড্রোজেন

অমরনাথ রায়

মৌলের পর্যায়সারণীর প্রথম শ্রেণীর পয়লা নম্বর মৌল হলো হাইড্রোজেন। এটি একটি মৌলিক গ্যাস। এর পরমাণু ক্রমাংক এক, যোজ্যতা এক এবং পারমাণবিক গুরুত্ব 1·008। রবার্ট বয়েল 1660 খ্রীষ্টাব্দে লৌহ চূর্ণের সঙ্গে লঘু খনিজ অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করেন। আর ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার হেনরি ক্যাভেণ্ডিশ 1766 খ্রীষ্টাব্দে এই গ্যাসটির প্রকৃত পরিচয় দিতে সক্ষম হন এবং প্রমাণ করেন যে এই গ্যাসটি জলের অন্যতম উপাদান।

তোমরা হয়তো জানো যে, হাইড্রোজেন হচ্ছে লঘুতম গ্যাস। বেলুনে এই গ্যাস ভরে ছেড়ে দিলে সেই বেলুন তরতর করে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 1 ঘন সেণ্টিমিটার হাইড্রোজেনের ওজন 0.00089 গ্রাম। হাইড্রোজেন দাহ্য গ্যাস অর্থাৎ নিজে জ্বলে, কিন্তু অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে না। এই গ্যাসটির কোন রং নেই, নেই কোন স্বাদও। বাতাসে কিংবা অক্সিজেনের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস নীলাভ শিখায় জ্বলে এবং সেই দহনের ফলে উৎপন্ন হয় জল। বিক্রিয়াটিকে সমীকরণের আকারে লিখলে দাঁড়ায় $2H_2 + O_2 = 2H_2O$। কোবাল্ট, নিকেল, প্ল্যাটিনাম, প্যালাডিয়াম প্রভৃতি ধাতু উত্তপ্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ ক'রে নেয়। ধাতুগুলি চূর্ণ অবস্থায় থাকলে বেশি পরিমাণে হাইড্রোজেন শোষিত হয়। এইভাবে ধাতুর গ্যাস শোষণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় অন্তর্ধৃতি। অন্তর্ধৃতির ফলে হাইড্রোজেন কঠিন ধাতুর মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। তারপর সেই ধাতুকে গরম করলে তার মধ্যে থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস আবার বেরিয়ে আসে। ধাতুর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা এই হাইড্রোজেন বিশুদ্ধ তো হয়ই, উপরন্তু সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে এর সক্রিয়তাও বেশি হয়। যেমন ধর, হলুদ রঙের ফেরিক ক্লোরাইডের ($FeCl_3$) দ্রবণের মধ্যে অন্তর্ধৃত হাইড্রোজেন পরিচালন করলে ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হয়ে বর্ণহীন ফেরাস ক্লোরাইডে ($FeCl_2$) পরিণত হয়। কিন্তু অন্তর্ধৃত হাইড্রোজেনের বদলে সাধারণ হাইড্রোজেন ব্যবহার করলে ফেরিক ক্লোরাইডের বিজারণ মোটেই ঘটে না। দ্রবণের হলুদ বর্ণের পরিবর্তন হয় না।

হাইড্রোজেন অণু দ্বিপরমাণুক। তার মানে একটি হাইড্রোজেন অণুতে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। ফলে হাইড্রোজেন অণুর সংকেতকে লেখা হয় H_2 রূপে। বহুরূপতার কথা হয়তো তোমরা পাঠ্য বইতে পড়ে থাকবে। বহুরূপতা হলো কোন কোন মৌলের এমন একটি ধর্ম, যে ধর্মের জন্যে মৌলটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করতে পারে এবং তার ঐ বিভিন্ন রূপভেদের মধ্যে ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। মৌলিক পদার্থের ঐ বিভিন্ন রূপগুলিকে বলা হয় 'রূপভেদ।' হাইড্রোজেনের দু'টি রূপভেদ আছে। সেগুলি হলো অর্থো হাইড্রোজেন ও প্যারা হাইড্রোজেন। সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেনে 75% অর্থো হাইড্রোজেন এবং 25% প্যারা হাইড্রোজেন থাকে। —273°C এর কাছাকাছি উষ্ণতায় হাইড্রোজেনের প্যারা রূপের পরিমাণ বাড়তে থাকে, কিন্তু উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থো রূপের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তবে সব উষ্ণতাতেই এই দুই রূপ একই সঙ্গে বর্তমান থাকে।

অধাতুরা সাধারণত তড়িৎ ঋণাত্মক হয়, কিন্তু হাইড্রোজেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম। অধাতু হওয়া সত্ত্বেও হাইড্রোজেন তড়িৎ ধনাত্মক। এই গ্যাস নানান কাজে লাগে। এর বিজারণ ধর্ম আছে বলে রসায়নাগারে একে বিজারক দ্রব্যরূপে ব্যবহার করা হয়। ঝালাইয়ের কাজে অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা (উষ্ণতা 2000°C) উৎপন্ন করতে এবং 'হাইড্রোজেন-টর্চ' রূপে 5000°C উষ্ণতা সৃষ্টি করতে এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ তেলকে হাইড্রোজেনায়িত করে চর্বিতে পরিণত করতে হাইড্রোজেনের প্রয়োজন হয়। এ ভিন্ন মিথাইল অ্যালকোহল, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, কৃত্রিম সার প্রস্তুতিতে এবং পেট্রোলিয়ম শিল্পে প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেনের প্রয়োজন হয়।

রসায়নাগারে সাধারণ উষ্ণতায় অবিশুদ্ধ জিংকের সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে উলফের বোতলে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করা হয়। জলপূর্ণ গ্যাস জারের জলকে নিচের দিকে নামিয়ে গ্যাস জারে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করা হয়। গ্যাস সংগ্রহের আগে সমগ্র যন্ত্রটিকে বায়ুনিরোধী করে নেওয়া হয়। কারণ

হাইড্রোজেনের সঙ্গে বায়ু মিশে গেলে একটি বিস্ফোরক গ্যাস-মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। রসায়নাগারে হাইড্রোজেন প্রস্তুতির রাসায়নিক সমীকরণটি এই রকম ঃ

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$

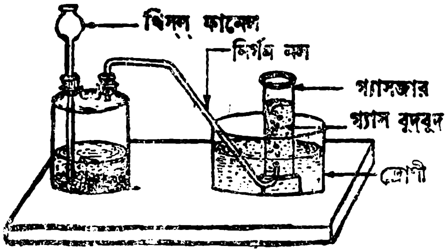

হাইড্রোজেন প্রস্তুতি

প্রয়োজনমত নিয়মিতভাবে হাইড্রোজেন গ্যাস পেতে হলে উল্‌ফ বোতলের বদলে কিপ্‌যন্ত্রে অবিশুদ্ধ জিংকের সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করতে হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, জিংকের বদলে কপার বা সিলভার ধাতু নিয়ে এই পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস করা যায় কি ? উত্তর হবে 'না', যায় না। তার কারণ তড়িৎ রাসায়নিক শ্রেণীতে হাইড্রোজেনের উপরে যে সব ধাতুর অবস্থান (Fe, Zn, Al, Mg, Ca প্রভৃতি), কেবলমাত্র তারাই লঘু খনিজ অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করতে পারে। হাইড্রোজেনের নিচের অবস্থানের ধাতুগুলি তা পারে না।

এই পদ্ধতিতে গাঢ় H_2SO_4 ব্যবহার করা চলে না, কারণ গাঢ় H_2SO_4—এর সঙ্গে Zn এর বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হয় সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস।

$$Zn + 2H_2SO_4 = ZnSO_4 + 2SO_2 + 2H_2O.$$

নাইট্রিক অ্যাসিডও তো খনিজ অ্যাসিড। তবে এই বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করলে ক্ষতি কি ? সে ক্ষেত্রে জিংক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় প্রথমে যে জায়মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন হবে তা অতিরিক্ত অ্যাসিড কর্তৃক জারিত হয়ে জলে পরিণত হবে। ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সঙ্গে অতি লঘু (1%) নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$Mg + 2HNO_3 = Mg(NO_3)_2 + H_2$$

জল হচ্ছে হাইড্রোজেনের সুলভ উৎস। কাজেই জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে আমরা হাইড্রোজেন গ্যাস পেতে পারি।

আবার Na, K প্রভৃতি ক্ষার ধাতুগুলি স্বাভাবিক উষ্ণতাতেই জলকে বিয়োজিত করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করতে পারে। যেমন $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$

লোহা লোহিত তপ্ত অবস্থায় স্টীমকে বিয়োজিত করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$3Fe + 4H_2O = Fe_3O_4 + 4H_2$$

আবার শ্বেত তপ্ত কার্বনের (1400 C) উপর দিয়ে স্টীম চালনা করলে পাওয়া যায় 'ওয়াটার গ্যাস' অর্থাৎ কার্বন মনক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ।

$$C + H_2O = CO + H_2$$

ওয়াটার গ্যাস থেকে কার্বন মনক্সাইডকে অপসারিত করলেই হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।

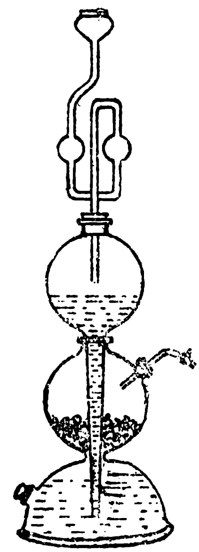
কিপ্‌ যন্ত্র

অ্যাসিড ও জলের মতো ক্ষারেও হাইড্রোজেন আছে। কাজেই ক্ষার থেকেও আমরা হাইড্রোজেন তৈরি করে নিতে পারি। ধাতব জিংককে 20% থেকে 30% কস্টিক সোডা দ্রবণ সহযোগে ফোটালেও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$Zn + 2NaOH = Na_2ZnO_2 + H_2$$

(সোডিয়াম-জিংকেট)

'জায়মান হাইড্রোজেন' হলো সদ্য উৎপন্ন হাইড্রোজেন। সাধারণ আণবিক হাইড্রোজেনের চেয়ে জায়মান হাইড্রোজেনের সক্রিয়তা অনেক বেশি। কিন্তু কেন বেশি ? রাসায়নিক বিক্রিয়াতে শক্তির রূপান্তর ঘটে। উৎসের রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন শক্তির সাহায্যে জায়মান হাইড্রোজেন সক্রিয়তা লাভ করে। সাধারণ আণবিক হাইড্রোজেনের চেয়ে জায়মান হাইড্রোজেন অনেক বেশী বিজারণধর্মী হয়।

উচ্চ উষ্ণতায় (2000°C) হাইড্রোজেন অণুকে ভেঙ্গে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত করা যায়। $H_2 \rightleftharpoons 2H$ দু'টি টাংস্টেন তড়িৎদ্বারের সাহায্যে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস সরু ধারায় প্রবাহিত করলে হাইড্রোজেন অণু ভেঙ্গে গিয়ে হাইড্রোজেন পরমাণু উৎপন্ন করে। এই পারমাণবিক হাইড্রোজেনও বেশ শক্তিশালী বিজারক দ্রব্য।

লঘুতম গ্যাস হাইড্রোজেনের কথা শেষ হলো। এখন ভেবে চিন্তে নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাও।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1। নিচের বিক্রিয়াগুলির মধ্যে কোনটিতে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না ?
(ক) ক্যালসিয়ামের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া।
(খ) সূক্ষ্ম জিংক চূর্ণের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া।
(গ) ম্যাগনাসিয়ামের সঙ্গে অতি লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া।

2। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টির পণ্যোৎপাদনে হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহৃত হয় না।
(ক) মিথাইল অ্যালকোহল (খ) নাইট্রিক অ্যাসিড (গ) অ্যামোনিয়া (ঘ) সালফিউরিক অ্যাসিড।

3। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্ রূপে প্রকৃতজাত হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।
(ক) আইসোবার খ) আইসোটোপ গ) আইসোমার

4। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টি হাইড্রোজেনের লঘুতম আইসোটোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?
(ক) ডয়টেরিয়াম (খ) তেজস্ক্রিয় (গ) প্রোটিয়াম

5। অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিচের কোন্‌টি ব্যবহৃত হয় না ?
(ক) Hg (খ) Na (গ) Fe (ঘ) Ca

6। নিচের কোন্ ধাতুটি উত্তপ্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ করে ?
(ক) Pt (খ) Zn (গ) Na (ঘ) Hg

7। নিচের কোন্ যৌগটি জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে না ?
(ক) CaH_2 (খ) NaH (গ) $Ca(OH)_2$ (ঘ) Na

8। নিচের কোন্‌টি আণবিক হাইড্রোজেনের পক্ষে সম্ভব নয়।
(ক) ক্লোরিনের সংস্পর্শে দহন (খ) ইথিলিনকে ইথেন যৌগে রূপান্তরিত করা (গ) Fe_3O_4 কে Fe তে রূপান্তরিত করা (ঘ) ফেরিক ক্লোরাইডকে বিজারিত করা।

9। প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 1 cc. হাইড্রোজেনের ওজন কত ? (ক) 1 গ্রাম (খ) 1.5 গ্রাম (গ) 0·001 গ্রাম (ঘ) 0·00089 গ্রাম।

উত্তর মালা

1। খ
2। ঘ
3। খ
4। গ
5। ক
6। ক
7। গ
8। ঘ
9। ঘ

তোমরা কি জানো ?

তোমাদের জন্য তিনটে বাঘা বাঘা বই আমরা প্রকাশ করেছি। তার মধ্যে প্রথমটা হলো :

আবিষ্কারের পিছনে ১৬৲

ডাঃ মনীশ প্রধান

ভূমিকা লিখেছেন সমরজিৎ কর

তোমরা তো জানো, অসুখ করলে আমরা ওষুধ খাই, ইনজেকশন নিয়ে থাকি, কিন্তু কি ভাবে এতসব আবিষ্কার হলো তা হয়তো জানো না, ডাক্তারী শাস্ত্রের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আবিষ্কারের নানান কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক—যা কিন্তু গল্প নয় মোটেই, সত্যি। সোজা কথায় তোমাদের জন্য অসাধারণ একটি বই।

আমাদের দু নম্বর বইটি হলো

বিজ্ঞানের হরেকরকম ৭৲

অনীশ দেব

এতে আছে ঃ মাপ কি করে এলো, পশুপক্ষীর শরীরে তাপ কিভাবে তৈরী হয়, বুদ্ধি কি করে মাপে, পৃথিবী কেমন দেখতে বা টিভিতে যা দেখা যায় না, এসব আশ্চর্য কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে সরস আলোচনা। এগুলো নিশ্চয় তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে। এসব বিষয় ছাড়াও প্রতি পাতায় মজার মজার ছবি উপহার দিয়েছেন লেখক নিজেই।

তিন নম্বর বইটিও কিন্তু প্রথম দুটোর চেয়ে কম নয় ! এতে আছে ঘড়ি ও সময় মাপা নিয়ে নানান অজানা কথা

ঘড়ি নিয়ে রূপকথা ৭৲

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

আদিম মানুষ কি করে সময় মাপতে শিখলো, কি ভাবে আবিষ্কার হলো ছায়াঘড়ি, সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি। এছাড়া ইলেকট্রনিক ঘড়ি, পারমাণবিক ঘড়ি তো আছেই। সব মিলিয়ে এ এক মজার বই। সঙ্গে অনেক ছবি ও দুটো ফটোগ্রাফ।

* * * * * * * *

যে যে বইটা হাতে পেতে চাও পাঁচ টাকা অগ্রিম সহ নিচের ঠিকানায় পোস্টকার্ড পাঠাও। তাহলে ঘরে বসেই পেয়ে যাবে।

স্বপ্নদীপ ॥ ৭ই শীতলা লেন, কলকাতা-৫

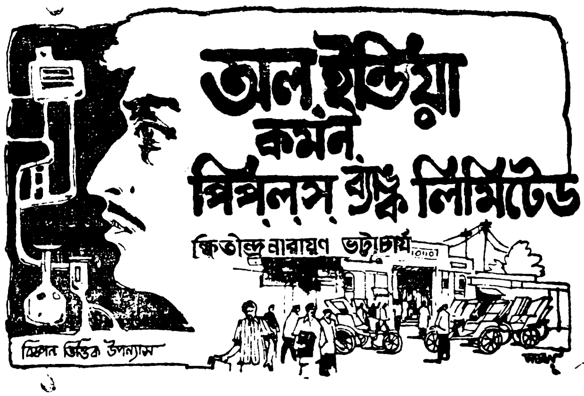

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। এটা কি করে সম্ভব? স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, লকারের দুটো চাবির একটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী। আলাপ হল সুশান্তর সঙ্গেও।

সতীনাথবাবু হঠাৎই এসে হাজির হয়েছেন সুশান্তকে কোন খবর না দিয়েই। তবে সুশান্তকে তিনি যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে, তা মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর। খাওয়া-দাওয়ার পর বললেন, একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে এলাম ব্যাঙ্কে! নতুন ম্যানেজারের সঙ্গেও আলাপ করে এলাম।

নদীর ধার দিয়ে একটা বাঁধানো রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটছিলেন সুশান্ত ও সতীনাথবাবু। সূর্য তখনও ডোবে নি। এমন সময় মনে হলো, উলটো দিক থেকে একজন লোক এগিয়ে আসছেন। কাছাকাছি আসতে চেনা গেল তিনি ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার মিস্টার ত্রিবেদী। গল্প করতে করতে তিনজনে খানিকক্ষণ এগিয়ে চললেন। ফিরতি পথে সবাই যখন গল্পে তন্ময়, তখনই পায়ের কাছে কেমন একটা সন্দেহজনক হিস্‌হিস্ শোনা গেল।

॥ এগারো ॥

সতীনাথবাবু সঙ্গে সঙ্গে টর্চ-এর আলো ফেললেন। তীব্র আলো। ঠিক চোখের ওপর ফেলতে পারলে সাপটা হয়তো আর নড়তে পারত না। কিন্তু তার আগেই সে কিলবিল করে রাস্তা পার হয়ে দূরের একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে অদৃশ্য হলো।

সুশান্ত রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মনে হলো ত্রিবেদীও কম ভয় পান নি! কিন্তু সতীনাথবাবুর মুখ দেখে মনে হলো এটা তিনি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবেই ধরে নিয়েছেন। তাঁর মুখের মৃদু মৃদু হাসি দেখেই তা আন্দাজ করা যায়। টর্চটা কিন্তু তিনি আর নিবিয়ে দিলেন না, সেইরকম তীব্র আলোয় রাস্তা আলোময় করে হাঁটতে লাগলেন, যদিও তখনও ঠিক সন্ধ্যে হয় নি, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি তখনও একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি।

খানিকক্ষণ চুপ্‌চাপ্ হাঁটার পর সতীনাথবাবুই মুখ খুললেন। বললেন, "এসব নির্জন জায়গায় সন্ধ্যার পর একটু সাবধান হওয়াই ভালো। অবশ্য পরিষ্কার রাস্তায় সাপ চলে বেড়াবে একথা কারই বা মনে আসবে? তবে সময় সময় ব্যতিক্রমও তো হতে পারে! কি বলেন মিঃ ত্রিবেদী?"

ত্রিবেদীর ভয় ভয় ভাবটা তখনও ভালো করে কাটে নি। একবার শুধু বললেন, "উঁ, কি বলছেন?"

"নাঃ, আপনি এমন দিলখোলা লোক, এই সামান্য ব্যাপারেই এত ঘাবড়ে গেলেন! মনে হচ্ছে সাপের ভয়টা আপনার এখনও কাটেনি। কিন্তু আপনার হাতে তো দিব্যি শক্ত একটা ছড়ি আছে, আর আমার হাতে রয়েছে টর্চ। ভয়ের কি আছে? বরং সুশান্তবাবুই বলতে গেলে এক রকম নিরস্ত্র। তাই না?

সতীনাথবাবু যে ইচ্ছে করেই সুশান্ত না বলে সুশান্ত-বাবু বললেন সেটা সুশান্তের বুঝতে অসুবিধা হলো না। অর্থাৎ ওরা যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং একই বাড়িতে রয়েছেন সেটা ত্রিবেদীকে জানাতে তিনি ইচ্ছুক ন'ন। ভাবটা অল্প আলাপ আছে, নদীর ধারে বেড়াতে এসে দু'জনের দেখা হয়ে গেল। তাই গল্প করতে করতে আসছিলেন, ঠিক যেমন ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

তাঁর সঙ্গে তো আজ সকালেই প্রথম আলাপ, কিন্তু গল্প করতে তাতে কোন বাধা হয় নি।

নদীর ধার ছেড়ে এবার ওঁরা শহরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। এখন দু' পাশেই বাড়ি, দোকান, লোকজনের

চলাফেরা! লোকালয়ের মধ্যে আর যাই থাক সাপের ভয় নিশ্চয়ই নেই। ত্রিবেদী মনে হলো এবারে বেশ ধাতস্থ হয়েছেন, কথাবার্তাও তাই স্বাভাবিক হয়ে এলো।

একটা মোড়ের মাথায় এসে সতীনাথবাবু ত্রিবেদীকে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার কোন্ দিকে যাবেন?"

ত্রিবেদী একটা দিক দেখিয়ে দিলেন। সতীনাথবাবু নমস্কার করে বললেন, "আমি যাব ঠিক উল্টো দিকে। তা হলে এখানেই আজকের মত শেষ দেখা। পরে নিশ্চয়ই দেখা হবে। তা ছাড়া ব্যাঙ্কে তো মাঝে মাঝে যেতেই হবে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে বেশ ভালো লাগে। তা ছাড়া আপনি যে খাঁটি বাঙ্গালী সেটাও এবেলা সঠিক জানতে পেরে আরও ভালো লাগছে। আজকাল অল্পবয়সীদের ধুতি পাঞ্জাবী পরা তো প্রায় উঠেই গেছে। এমন কি সামাজিক ক্রিয়াকর্মেও—বিয়েটিয়েতে যোগ দিতে গেলেও কেউ স্যুট পরে যেতে লজ্জা পায় না। আপনি তো শুনেছি বিদেশের অনেক জায়গা দেখেছেন, আর কোথাও এমন দেখেছেন কি?"

ত্রিবেদীর উচ্ছলতা প্রায় ফিরে এসেছিল। হেসে উত্তর দিলেন, "দ্যাট্স্ নাউ অ্যান্ ইণ্টারন্যাশনাল ড্রেস। পৃথিবীর সব দেশই ওটা অ্যাডাপ্ট করছে। এমন কি জাপানেও দেখেছি সব্বাইকার ঐ ড্রেস। মেয়েরাও কিমোনো ছেড়ে স্কার্ট ধরেছে। শুধু ফেস্টিভ্যালট্যালের সময় পুরোনো ধরনের পোশাক পরে।"

সতীনাথবাবু হেসে বললেন, "ছেলেদের দোনলাটা হয়তো এ যুগে সুবিধাজনক, কিন্তু মেয়েদের শাড়ির তুলনা নেই। অত তো দেশ ঘুরেছেন, কোথাও ভারতীয় মেয়েদের শাড়ি ছাড়া দেখেছেন? ইংল্যাণ্ডই বলুন, আমেরিকাই বলুন—সব শাড়ি। বরঞ্চ ওখানকার মেয়েরাই শাড়ি দেখে মুগ্ধ হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, দ্যাটস্ রাইট। সাচ্ কথা বলেছেন। সত্যি তাই। বাট্ জীন্‌স্? আমেরিকায় অনেক বাঙ্গালী বয়স্কা লেডিকেও জীন্‌স্ পরতে দেখেছি।"

সতীনাথ বাবু হেসে বললেন, "যুগের হাওয়া। আচ্ছা, এবার নিজের নিজের পথ ধরা যাক, কেমন? সুশান্ত বাবু, আপনি কোন্ দিকে যাবেন?"

সুশান্ত এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। বললো, "আপাততঃ আমিও আপনার পথেই খানিকটা এগোব। তারপর—"

ত্রিবেদী একটু নড্ করে বললেন, "গুড নাইট্।"

মোড় থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে সতীনাথবাবু ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "আজকের গাড়ি ধরতে গেলে বড্ড তাড়াহুড়ো করতে হবে। যদিও বেশ জরুরি কাজ ফেলে এসেছি তবুও সে একরকম ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে। আরও ২/১ দিন এখানে থেকে যাব ভাবছি। বারে বারে আসা-যাওয়ার চাইতে সেটা অনেক সুবিধাজনক, তা ছাড়া তোমার ঐ ছোকরাটি রাঁধে ভালো। আরও দিন দুই তোমার আতিথ্য নেওয়া যাক, কেমন?"

সুশান্ত সানন্দে বলল, "সে তো খুব ভালো কথা। ব্যাপারটার যাতে তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হয়ে যায় তাই তো চাইছি। বুঝতেই পারছেন কাকা, আমার ওপর দিয়ে কি রকম টেন্‌শন চলছে!"

একটু পরেই ওঁরা সুশান্তর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। সতীনাথ বাবু পাঞ্জাবী খুলতে খুলতে বললেন, "কোথায় তোমার সেই ছোকরাটি, নামটা ভুলে গেলাম। তা যে নামই হোক, ওকে একটু চা-টা করতে বল। নইলে শরীরটা যুৎসই লাগছে না।"

"চা খাবেন? নাকি কফি বানাতে বলব?"

"কফি! আরে, সে তো আরও চমৎকার হবে। তাই বল।" বলতে বলতে সতীনাথবাবু তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন হাতমুখ ধুতে।

কফি এলো। আরাম করে চেয়ারে বসে পেয়ালায় সুদীর্ঘ চুমুক দিতে দিতে সতীনাথবাবু বললেন, "ভালো কথা, তোমার সেই বন্ধু সরযূপ্রসাদ, না কি নাম, তার কোন খবর পেলে? কবে ফিরছে?"

সুশান্ত বললো, "তা তো জানি না, বাড়িতে তো একটা চাকর ছাড়া কেউ থাকে না। বাবুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেও মুলুক ঘুরে আসতে গেছে। তবে আজকালই হয়তো ফিরবে। কিংবা হয়তো ফিরেও এসেছে। সরযূ-প্রসাদ ফিরে এসে তাকে না দেখতে পেলে যে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে! ঘরের সব কিছুই তো আগের মত সাজানো রয়েছে—ইন্‌ট্যাক্ট। কোন জিনিস এদিক্‌ওদিক্ হলে চাকর বাবাজীর কি রক্ষা থাকবে?"

"তা হলে সরযূপ্রসাদ শীগ্‌গিরই ফিরছে? এরকম মাঝে মাঝে চলে যায় বুঝি বিদেশে? বেশ পয়সাওয়ালা লোক তা হলে?"

"মনে হয় তাই। আর খুব দিল্‌দরিয়া। পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরেছে। যখন তখন আমেরিকায় চলে যায় শুনেছি। আবার কিছুদিন পরে ফিরে আসে। কলকাতায়ও বহুদিন ছিল। ওখানেই পড়াশোনা করেছে। বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশতে তাই ভালবাসে।"

"ওর সঙ্গে দেখা হলে ভালো হ'ত। হয়তো সাহায্যও পাওয়া যেত। দেখা যাক কবে ফেরে। আজকালের

মধ্যেও ফিরতে পারে আশা করছ তুমি? কাউকে কিছু বলেটলেও যায় নি?"

"না, ঐ তো ওর স্বভাব। হঠাৎ থেকে থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ে, আগেভাগে কাউকে না জানিয়ে। তেমনি হঠাৎ আবার এসে হাজির হয়। এই তো শুনেছি, ওর সঙ্গে গল্প করে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।"

"সে আনন্দটার ভাগ পেলে আমার পক্ষেও সুবিধে হ'ত। দেখি তো! প্রোগ্রাম যখন বদলে ফেলেছি তখন এ দু'দিন হয়তো কাজটা একটু গড়িয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া—"

সতীনাথবাবু আবার মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তাঁর সেই বিশেষ ধরনের হাসি। দেখলে মনে হবে নেহাৎই হাসি, কিন্তু সুশান্ত জানে ঐ হাসির মধ্যে গভীর কোন অর্থ লুকিয়ে আছে।

সে এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করলো, "তা ছাড়া—বলে কথা শেষ না করেই হাসছেন! কি ব্যাপার বলুন তো?"

"না না, এমন কিছুই সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। সেই পুলিশের বড় কর্তার কথা মনে পড়লো, তাই একটু হাসলাম। সেই যে যিনি কবিতা লেখেন, আমাকে একদিন তাঁর কবিতা পড়িয়ে শোনাবেন বলেছিলেন। এই সুযোগে সেই কবিতাগুলোও শুনে আসা যাবে।"

এই সুযোগে কবিতাগুলো শুনে আসা যাবে

সতীনাথবাবু কি ঠাট্টা করছেন? সুশান্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। একটু চুপ করে থেকে বললো, "কিন্তু সে তো হিন্দী কবিতা। তার মধ্যে আপনি কি রস পাবেন।"

"পাব পাব। কবিতা কবিতাই, তা সে যে ভাষাতেই লেখা হোক না কেন। ফারসী জানি না, তাই বলে হাফিজের কবিতা কি খারাপ লাগে? ওমর খৈয়মের রুবাইয়াৎ? তার তো তুলনা নেই। এমন কি উর্দু না জেনেও, যখন গালিবের কবিতা কেউ আবৃত্তি করে, আমার তো বেশ ভালোই লাগে। ওদের কবি সম্মেলন—যাকে ওরা বলে মুশারা, শোন নি কোন দিন? সেখানে অবিশ্যি কবিরা নিজের নিজের কবিতাই পড়েন এবং প্রত্যেকটি লাইন একবার পড়ে আবার পুনরাবৃত্তি করেন, সেটাই নিয়ম। আর সেই সময় তোমাকে কেয়াবৎ কেয়াবৎ বা ঐ ধরনের কিছু বলে বাহবা দিতেই হবে, নইলে লোকে বলবে লোকটা বেরসিক। আর, হিন্দী গান বিশেষ করে ফিল্মি গান—তো এ যুগের তরুণদের সবচেয়ে প্রিয়। শোন নি সরস্বতী পূজোর সময় মাইকে বাজে?—সারাদিন সারারাত, অবিশ্রান্ত, ক্লান্তিহীন?"

"বিশ্বকর্মা পূজোয় আরো বেশি শুনেছি।" সুশান্ত হেসে জবাব দিল।

"তবেই বোঝ। হিন্দী গান যদি লোকের এত ভালো লাগে—ভালো নিশ্চয়ই লাগে, নইলে বাজাবে কেন, তা হলে হিন্দী কবিতা খারাপ লাগবার কোন কারণ নেই। তা ছাড়া একটু আধটু হিন্দী তো আমি শিখেছিও। হিন্দী বই গড়গড় করে পড়তে পারি—লিখতে পারি দেবনাগরী অক্ষরে। সেদিন একটা হিন্দী গল্পের বই পড়ছিলাম—"আঁখ কি কিরকিরি"। বেশ ভালোই লাগছিল, পরে অবশ্য দেখলাম ওটা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' বইটার হিন্দী অনুবাদ। নাম শুনে ভড়কে গিয়েছিলাম গোড়ায়। কাজেই হিন্দী কবিতা কেন খারাপ লাগবে? পুলিশের লেখা হলেই কি তার যত দোষ?"

"হিন্দী তো আমিও খানিকটা শিখেছিলাম। দস্তুর মত ক্লাস করে। অসুবিধা হত ঐ জেণ্ডারটা নিয়ে। হিন্দীতে তো শুধু পুংলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ। ক্লীবলিঙ্গের বালাই নেই। বাস্ আসছে বলতে গেলে বাস্ আতা হ্যায় হবে, না আতি হ্যায় হবে এই নিয়ে ভাবনায় পড়তাম। পরে শুনলাম বাস্ স্ত্রীলিঙ্গ, সুতরাং আতি হ্যায়ই হবে। আতা নয়। হ্যায় বললাম বটে কিন্তু লিখতে হবে 'হৈ'। হৈ-এর উচ্চারণই হ্যায়। এখন অবিশ্যি শুনতে শুনতে অনেকটা পোক্ত হয়ে গেছি।"

"তা হিন্দীকেই শুধু দোষ দিলে কি হবে? তোমাদের অত সাধের জার্মান ভাষাও তো ঠিক তাই। ক্লীবলিঙ্গ নেই। সেখানেও হয় ম্যাস্কুলিন—পুংলিঙ্গ, নয় তো ফেমিনিন—স্ত্রীলিঙ্গ! তাই না? তার পর আমাদের এত সাধের দেবভাষা সংস্কৃত। স্ত্রী, দার এবং কলত্র—তিনটিরই এক মানে—স্ত্রী। কিন্তু এর মধ্যে স্ত্রী হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ, দার হচ্ছে পুংলিঙ্গ আর কলত্র হচ্ছে ক্লীবলিঙ্গ। তার ওপর দার শব্দটি নাকি নিত্যবহুবচন—অর্থাৎ সব সময়েই বহুবচন। অর্থাৎ ওরকম স্ত্রীলোক একাই একশ'।"

বলেই সতীনাথবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। সুশান্তও যোগ দিল সেই হাসিতে, তবে উচ্চকণ্ঠে নয়।

হাসি থামলে সতীনাথবাবু বললেন, "আর বাজে কথা নয়, কালকের প্রোগ্রামটা এখনই করে ফেলতে হবে। কোথায় কোথায় যাব কখন যাব, তুমি কোন্ কোন্ সময়ে আর সঙ্গে থাকবে, কখন নয় ইত্যাদি। অবশ্য তোমার সঙ্গে আমাকে একসঙ্গে দেখলে সবাই যে ধরে ফেলবে এ ভয় করো না। আমার মুহূর্তের মধ্যে সামান্য মেক্ আপ্ দিয়ে চেহারা বদলে ফেলার কথা তো আগেই বলেছি। সে সব সরঞ্জাম সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে, এমন কি সময় সময় মিনিটখানেক কি তারও কম সময়ের মধ্যে এই চেহারা বদল করার কৌশল আমি শিখে এসেছি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডএ, যখন ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলাম তখনই। তারপর তোমার ঐ ত্রিবেদী সাহেবের ইণ্টারন্যাশনাল ড্রেস। সাধারণতঃ ধুতিপাঞ্জাবী পরলেও দরকার হলে ঐ ইণ্টারন্যাশনাল ড্রেস পরতেও কোন বাধা নেই আমার। আর সেই 'শ্যাম-বেশে' মেক্‌আপ করার পর আমাকে চিনতে পারা শুধু ত্রিবেদী কেন, কোন পুলিশের বাবারও সাধ্য নেই।"

সুশান্ত একটু রসিকতার সুযোগ নিলো এবার। বললো, "পুলিশের বাবাকে আর এখানে কোথায় পাচ্ছেন? যে দু'জন পুলিশের বড় কর্তা আর ছোট কর্তা আছেন তাঁদের একজনকে তো আপনি কবি বলে বাতিলই করে দিয়েছেন। বাকি রইলেন ছোট কর্তা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছোট কর্তার সঙ্গেও কাল দেখা করতে হবেই। খুব সিন্সিয়ার লোক। কবিতা লেখা দূরে থাক, কেউ কবিতা আওড়ালে শতহস্তেন বাজিনাং—অর্থাৎ ঘোড়া থেকে যেমন লোকে একশ' হাত দূরে থাকা নিরাপদ মনে করে ইনিও তেমনি কবিতা পাঠকের কাজ থেকে একশ' হাত দূরে থাকতে পারলে খুশি হন।"

"খুশি হন বলছেন কেন? দূরে থাকবার চেষ্টা করেন না বুঝি?"

"পুলিশের জীবনে কি সে সুখ আছে যে যা ইচ্ছে করব তাই হবে? বড় কঠিন জীবন পুলিশের জীবন।

(ক্রমশঃ)

শব্দ

অলক চক্রবর্তী

সংজ্ঞা

শব্দ ঃ কোনো কম্পনশীল বস্তু থেকে স্থিতিস্থাপক জড় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে যে শক্তি আমাদের কানে বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি করে, তাকে শব্দ বলে।

সুরশলাকা বা স্বনক ঃ এটি ইস্পাত দিয়ে তৈরী U-আকৃতির একটি দণ্ডের মতো। U-আকৃতির নিচের দিকে একটি সরল দণ্ড থাকে। U-অক্ষর উৎপাদনকারী অংশদ্বয়কে বাহু বলে। স্বনকের যে-কোনো বাহুকে কাপড়-জড়ানো কোনো দণ্ড দিয়ে আঘাত করলে স্বনকের কম্পন হয় এবং একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের শব্দ বেরুতে থাকে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন পরীক্ষার জন্যে স্বনক ব্যবহৃত হয়।

পর্যায়কাল ঃ কম্পমান বস্তুকণার একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে বস্তুকণার পর্যায়কাল বলে।

কম্পাংক ঃ এক সেকেণ্ডে কোনো কম্পমান বস্তুর যতবার পূর্ণ কম্পন (বা পূর্ণ দোলন) সম্পন্ন হয় সেই সংখ্যাকে ঐ বস্তুর কম্পাঙ্ক বলে।

বিস্তার ঃ কম্পমান বস্তুকণার গড় অবস্থান থেকে কোনো দিকে সর্বাধিক সরণকে বস্তুকণার বিস্তার বলে।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য ঃ তরঙ্গের উপর অবস্থিত পরপর সমদশা-সম্পন্ন দু'টি কণার মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।

শব্দের বেগ ঃ শব্দের নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে নির্দিষ্ট সময় লাগে ; তাই শব্দের নির্দিষ্ট বেগ আছে। একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে শব্দের অতিক্রান্ত দূরত্বকেই বেগ বলে। দেখানো যায় যে, শব্দের বেগ = কম্পাঙ্ক × তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

প্রতিধ্বনি ঃ স্বনক থেকে উদ্ভূত শব্দতরঙ্গ যদি দূরে অবস্থিত কোনো প্রতিফলক দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে আবার মূল শব্দের কাছে এসে উপস্থিত হয়, তখন মূল শব্দের যে পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাকে শব্দের প্রতিধ্বনি বলে।

শব্দোত্তর তরঙ্গ ঃ 20,000 এর বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না। স্বনকের কম্পাঙ্ক 20,000 এর বেশি হ'লে তা থেকে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গকে শব্দোত্তর তরঙ্গ বলে।

সুরসমৃদ্ধ শব্দ ঃ সাধারণভাবে যে শব্দ স্বনকের নিয়মিত কম্পনে উৎপন্ন এবং শ্রুতিমধুর হয়, তাকে সুরসমৃদ্ধ শব্দ বলে।

সুরবর্জিত শব্দ ঃ স্বনকের অনিয়মিত কম্পনে উৎপন্ন বা অন্য কোনো কারণের জন্যে উৎপন্ন শ্রুতিকটু শব্দকেই সুরবর্জিত শব্দ বলে।

প্রাবল্য ঃ যে শব্দতরঙ্গ যত বেশি শক্তি বহন করে এবং শ্রোতার কাছে অধিকতর কম্পনের তথা বিস্তারের সৃষ্টি করে তার প্রাবল্য তত বেশি বলা হয়ে থাকে।

তীক্ষ্ণতা ঃ স্বনকের কম্পাঙ্কের উপর সুরের তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে। কম্পাঙ্ক বাড়লে তীক্ষ্ণতা বাড়ে ; কম্পাঙ্ক কম হলে তীক্ষ্ণতাও কম হয়।

গুণ বা জাতি ঃ দুটি একই প্রাবল্য ও একই তীক্ষ্ণতা (বা একই কম্পাঙ্ক) বিশিষ্ট শব্দের মধ্যে যে ধর্মের দ্বারা তাদের তফাৎ বোঝা যায়, তাকেই গুণ বা জাতি বলে।

স্বর ঃ স্বনক নিঃসৃত কোনো শব্দের মধ্যে একাধিক কম্পাঙ্ক থাকলে তাকে স্বর বলে।

সুর ঃ কোনো স্বনক-নিঃসৃত শব্দের মধ্যে যদি একটি-মাত্র কম্পাঙ্ক থাকে তাকে সুর বলে।

মূলসুর ঃ কোনো স্বরে যেসব বিভিন্ন সুর থাকে, তাদের মধ্যে যে সুরের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম তাকে মূলসুর বলে।

উপসুর ঃ কোনো স্বরে যেসব বিভিন্ন সুর থাকে, তাদের মধ্যে যেসকল সুরের কম্পাঙ্ক মূলসুরের কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি তাদের উপসুর বলে।

সমমেল ঃ যদি উপসুরের কম্পাঙ্ক মূলসুরের কম্পাঙ্কের সরল গুণিতক হয়, তবে সেইসব উপসুরগুলিকে সমমেল বলে।

অষ্টক ঃ কোনো সুরের কম্পাঙ্ক যদি অন্য একটি সুরের কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ হয় তবে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অষ্টক বলে।

প্রশ্নোত্তর

1. সূর্যে কোনো বিস্ফোরণ হলে বিস্ফোরণের আওয়াজ আমরা শুনতে পাই না কেন?

শব্দ বিস্তারের জন্যে মাধ্যমের প্রয়োজন। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে অনেকখানি শূন্য স্থান রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে শব্দ বিস্তারলাভ করতে পারে না। সেজন্যেই সূর্যে কোনো বিস্ফোরণ হলে সেই বিস্ফোরণের শব্দ আমরা শুনতে পাই না।

2. একটা ছোট শিশি আর একটা বড় বোতলে ফুঁ দিলে শ্রুত শব্দের পার্থক্য হয় কেন?

ছোট শিশি বা বড় বোতলের মধ্যে যে বায়ুস্তম্ভ আছে, ফুঁ দিলে ঐ বায়ুস্তম্ভের কম্পন হয়, ফলে শব্দ সৃষ্টি হয়। ছোট শিশিতে কম্পাঙ্ক বেশি হয়, ফলে তীক্ষ্ণতাও বেশি হয় শব্দের; যেখানে বড় বোতলে কম্পাঙ্ক কম হওয়ায় শব্দ কম তীক্ষ্ণ হয়।

3. অন্ধকার ঘরে কোনো খালি কলসীতে জল ঢাললে শব্দ শুনে বোঝা যায় যে কলসীটি জলপূর্ণ হয়েছে। এর কারণ কি?

বায়ুস্তম্ভের কম্পন দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক; অর্থাৎ দৈর্ঘ্য যত হবে কম্পাঙ্ক বা তীক্ষ্ণতা তত বাড়বে। শূন্য কলসীতে যখন জল ঢালা হয়, তখন জল ঢালার জন্যে কলসীর ভিতরের বায়ু কাঁপতে থাকবে। ফলে কলসীর মধ্যেকার বায়ুস্তম্ভের কম্পনের সৃষ্টি হয় ও শব্দ শোনা যায়। কলসীটি যত জলপূর্ণ হয়ে আসবে, বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্য তত কমে যাবে এবং শব্দের কম্পাঙ্ক তত বাড়বে। এইরকম হতে হতে যখন কলসীটি সম্পূর্ণ ভর্তি হবে, তখন শব্দের কম্পাঙ্ক তথা তীক্ষ্ণতা স্থির হয়ে যাবে। এই স্থির শব্দ শুনে বোঝা যায় যে কলসীটি জলপূর্ণ হয়ে গেছে।

4. জলের উপর বৃষ্টি পড়লে সেই শব্দ বাইরে বায়ুমাধ্যমে থেকে বিশেষ শোনা না গেলেও জলে ডুবে থাকলে ভালই শোনা যায় কেন?

দুইটি মাধ্যমের ঘনত্বের পার্থক্য খুব বেশি হলে শব্দ তাদের একটি থেকে অপরটিতে সহজে যেতে পারে না। বায়ু ও জলের ঘনত্বের পার্থক্য খুব বেশি হওয়ায় জলে বৃষ্টি পড়ার শব্দ জল মাধ্যমের ভিতর দিয়ে বায়ুতে সহজে প্রবেশ করে বিস্তারিত হতে পারে না। সেইজন্যই জলের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ জলের বাইরে থেকে বিশেষ শোনা না গেলেও জলে ডুবে থাকলে ভালই শোনা যায়।

5. স্থির বায়ুতে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে শীতকালে শব্দ শোনা না গেলেও বর্ষাকালে শ্রুতিগোচর হয় কেন?

মাধ্যমের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে ঘনত্ব হ্রাস পায়। শব্দের বেগ তাতে বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই বর্ষাকালে বায়ুমাধ্যমে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ শীতকাল অপেক্ষা অনেক বেশি থাকায় বায়ুর আর্দ্রতা তখন বাড়ে, ফলে শব্দের বেগও বেড়ে যায়। স্থির বায়ুতে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে এজন্যেই শীতকালে শব্দ শোনা না গেলেও বর্ষাকালে শ্রুতিগোচর হয়।

6. ভোরবেলায় ও দুপুরে বায়ুতে শব্দের বেগ আলাদা হয় কেন?

উষ্ণতাবৃদ্ধিতে বায়ুতে শব্দের বেগ বাড়ে। ভোরবেলার চেয়ে দুপুরের তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় তাই দুপুরে শব্দের বেগ অপেক্ষাকৃত বেশি হয়।

7. নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিতে চেঁচিয়ে ডাকল, সে শুনতে পেল না। তারপর হাতের তালু বাঁকিয়ে মুখের কাছে নিয়ে সমানে চেঁচিয়ে ডাকলো। তখন সে শুনতে পেল কেন?

বাঁকানো হাতের তালু ডাকার শব্দের অবতল প্রতিফলকের কাজ করে। সেজন্য মূলশব্দ ও প্রতিফলিত শব্দ একইসঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির কানে জোরতরভাবে পৌঁছায়, সে শুনতে পায়।

8. দেশলাইয়ের বাক্স ও সূতো দিয়ে তৈরী খেলনা টেলিফোনের সূতো টানটান করে রেখে একটি বাক্সে মুখ লাগিয়ে কথা বললে অপরপ্রান্তের বাক্সে কান পেতে ঐ কথা শোনা যায় কেন?

একটি বাক্সে মুখ লাগিয়ে কথা বললে বাক্স ও সুতো উভয়েরই কম্পন হয়। শব্দ কঠিন মাধ্যম দিয়ে সহজেই বিস্তারিত হতে পারে বলে অন্যপ্রান্তের বাক্সে কান পাতলে ঐ কথা শোনা যায়।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, জয়পুরিয়া কলেজ, কলি-5

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই

ভারতের খনিজ সম্পদ	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪·০০
প্রযুক্তি সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা	পতাকীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১২·০০
ভেক্টর বীজগণিত ও ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক জ্যামিতি	শ্রীপতিরঞ্জন চৌধুরী	১২·০০
কলন বিদ্যা	মহাদেব দত্ত শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৫·০০
তারামণ্ডল পরিচয় ও বিশ্বের বিশালতা	কামিনীকুমার দে	৮·০০
রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগপদ্ধতি	ব্রজেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা ভাগবত দাশগুপ্ত বাসুদেব অধিকারী	১৭·০০
পদার্থের ধর্ম (২য় সংস্করণ)	দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০·০০
জ্যামিতীয় আলোকবিজ্ঞান	অরবিন্দ নাগ	১৯·০০
তাপগতিতত্ত্ব	অশোককুমার ঘোষ	২৪·০০
ভৌত রসায়ন	নিত্যানন্দ কুণ্ডু	২২·০০
ব্যবহারিক জৈব রসায়ন	জীবনরঞ্জন ভট্টাচার্য	১১·০০
শারীরবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ব	যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র	৮·০০
পূর্বভারতের ফসল	মতিলাল মজুমদার	১৫·০০
উদ্যানবিজ্ঞান এবং ফল ও সব্জি সংরক্ষণ (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)	রামানন্দ চক্রবর্তী	১৫·০০
সাইটোলজি	সুহিতা গুহ	১৮·০০
প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস ও পরিবেশ বিজ্ঞান	সীমানন্দ অধিকারী	৭·০০
পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা	দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০·০০
নিম্নতাপমাত্রা বিজ্ঞান	ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী	১২·০০

আরো অন্যান্য বইয়ের জন্য যোগাযোগ করুন :

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩, ফোন : ২৬-৭৮৫৪

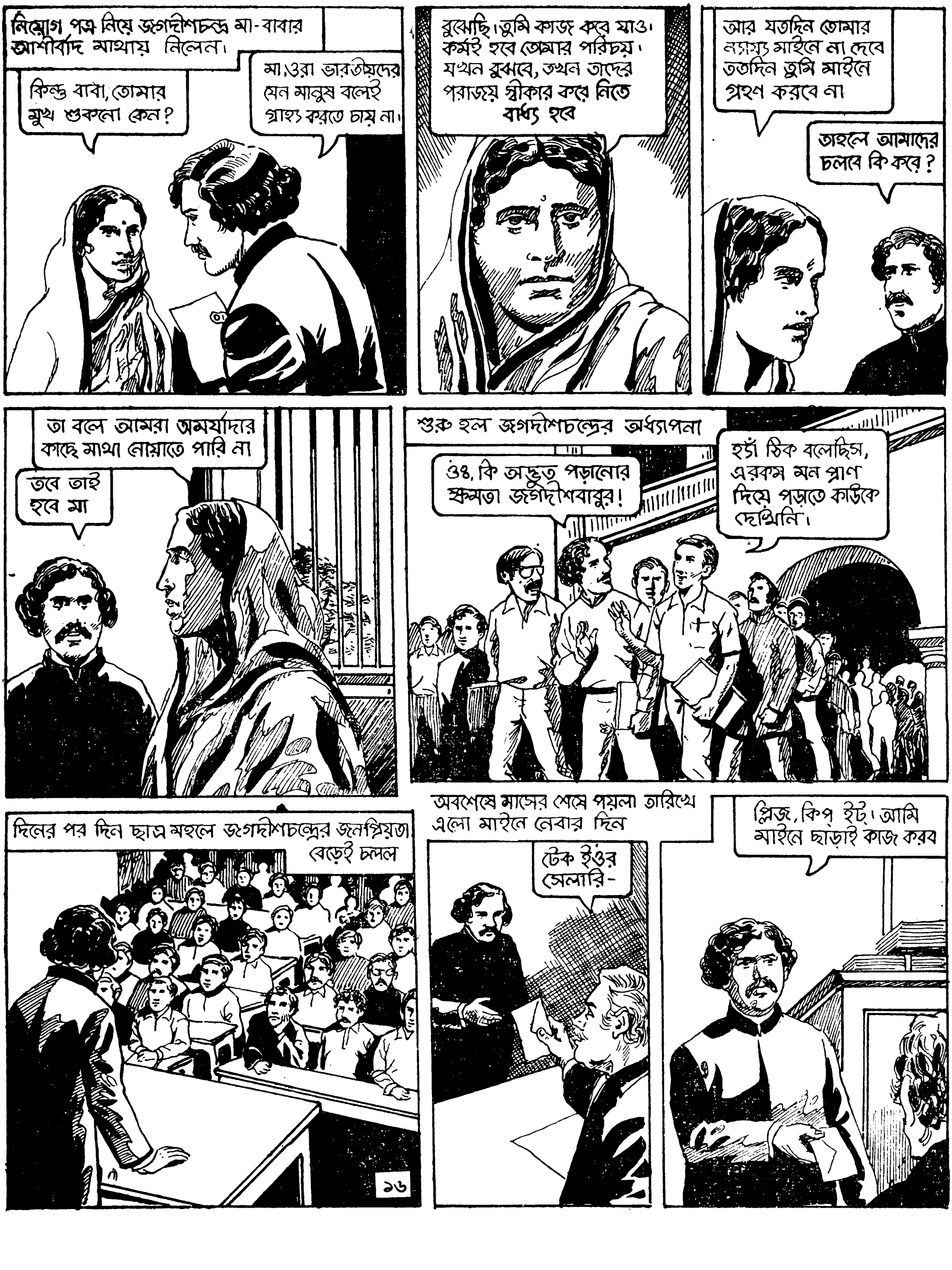
নিয়োগ পত্র নিয়ে জগদীশচন্দ্র মা-বাবার আশীর্বাদ মাথায় নিলেন।
কিন্তু বাবা, তোমার মুখ শুকনো কেন?
মা, ওরা ভারতীয়দের যেন মানুষ বলেই গ্রাহ্য করতে চায় না।
বুঝেছি। তুমি কাজ করে যাও। কর্মই হবে তোমার পরিচয়। যখন বুঝবে, তখন তাদের পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে
আর যতদিন তোমার ন্যায্য মাইনে না দেবে ততদিন তুমি মাইনে গ্রহণ করবে না
তাহলে আমাদের চলবে কি করে?
তা বলে আমরা অমর্যাদার কাছে মাথা নোয়াতে পারি না
তবে তাই হবে মা
শুরু হল জগদীশচন্দ্রের অধ্যাপনা
ওঃ, কি অদ্ভুত পড়ানোর ক্ষমতা জগদীশবাবুর!
হ্যাঁ ঠিক বলেছিস, এরকম মন প্রাণ দিয়ে পড়াতে কাউকে দেখিনি।
দিনের পর দিন ছাত্র মহলে জগদীশচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলল
অবশেষে মাসের শেষে পয়লা তারিখে এলো মাইনে নেবার দিন
টেক ইওর সেলারি-
প্লিজ, কিপ ইট। আমি মাইনে ছাড়াই কাজ করব

গ্রহ পরিচয়-৪

বলয়ের রাজা শনিগ্রহ

বিমান বসু

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে দূরের যে গ্রহটিকে শুধু চোখে আমরা দেখতে পাই তা হলো শনি। আয়তনে শনি হলো প্রায় বৃহস্পতিরই সমান, কিন্তু দূরে থাকার দরুন আকাশে একে খুব একটা উজ্জ্বল দেখায় না। দেখায় হালকা হলদে রঙের মাঝারী গোছের একটা তারার মতো। এ ছাড়া, দূরে থাকার দরুন কক্ষপথে শনির গতিও খুব মন্থর। সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরতে শনির সময় সময় লাগে প্রায় সাড়ে ঊনত্রিশ বছর। ফলে আকাশ পথে এর চলাটাও খুব আস্তে দেখায়।

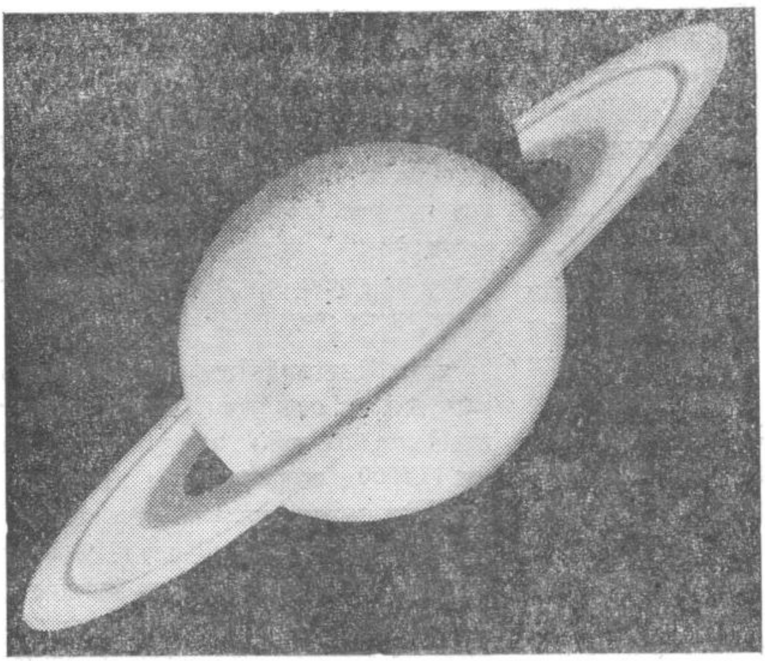

শনিগ্রহ

এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। আজ থেকে মাত্র দুশো বছর আগেও মানুষের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীকে নিয়ে সৌরমণ্ডলে মোট গ্রহের সংখ্যা হলো ছয়, আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বাইরের গ্রহ হলো শনি। আজ অবশ্য আমরা জানি, এ ধারণা ভুল। কারণ শনির পরে আরও তিনটি গ্রহ আছে যার খোঁজ পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে।

শুধু চোখে কোনও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া না গেলেও, দূরবীনে শনিগ্রহকে দেখায় অদ্ভুত সুন্দর। আর সেই সৌন্দর্যের কারণ হলো তার বলয় বা রিং। সাম্প্রতিক-কালে আমরা জানতে পেরেছি যে, বৃহস্পতি, ইউরেনাস এবং নেপচুন গ্রহেরও বলয় আছে। কিন্তু শনির বলয়ের কাছে সেগুলি তুচ্ছ। সৌন্দর্য এবং জটিলতায় শনির বলয় হলো অদ্বিতীয়।

শনির বলয়ের সন্ধান সর্বপ্রথমে পাওয়া গিয়েছিল 1610 সালে। সে বছর জুলাই মাসে ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তাঁর সদ্যনির্মিত দূরবীনে শনিকে দেখতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন যে, অন্যান্য গ্রহের মতো শনির আকার গোল নয়, তার দুপাশে কাপের হাতলের মতো যেন দুটি হাতল লাগানো। গ্যালিলিও প্রথমে মনে করেছিলেন, তিনি হয়তো শনির সঙ্গে তার দুটি উপগ্রহকে দেখেছেন। কিন্তু এ ধারণা ভেঙে গেল, যখন তিনি দেখলেন যে কয়েক বছরের মধ্যে ঐ হাতলের মতো বস্তু দুটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, অদৃশ্য হয়ে যাবার কয়েক বছর পরে ঐ 'হাতল' দুটিকে আবার দেখতে পাওয়া গেল। গ্যালিলিওর কাছে যে দূরবীন ছিল তা দিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু আর দেখা সম্ভব ছিল না। সুতরাং শনির ঐ 'হাতল' দুটি আসলে কি তিনি তাঁর জীবনকালে জানতে পারেন নি। এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গ্যালিলিওর মৃত্যুর 17 বছর পর।

1655 সালে হল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌স অনেক বেশি শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে শনি-গ্রহকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, শনিগ্রহের 'হাতল'গুলি আসলে হলো বিশাল একটি বলয় যা গ্রহটিকে কোথাও স্পর্শ না করে তাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে আছে। 1659 সালে হাইগেন্‌স তাঁর ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কক্ষপথে শনিগ্রহ প্রায় 26·7 ডিগ্রী হেলে থাকার দরুন তার বলয়কে পৃথিবী থেকে প্রতি 15 বছর অন্তর প্রায় ধার বরাবর দেখা যায়, যার ফলে চ্যাপটা বলয়টি প্রায় অদৃশ্য বলেই মনে হয়।

ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌সের সময় বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, শনির বলয় একটিই। কিন্তু পরে এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। 1675 সালে ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গিওভানি ক্যাসিনি আরও শক্তিশালী দূরবীনে দেখতে পেলেন যে, শনির বলয়টি দুটি ভাগে ভাগ করা। একটি বড় বলয়ের মধ্যে একটি ছোট বলয় আছে আর তাদের মাঝের জায়গাটা ফাঁকা যা দূরবীনে কালো দেখায়। ক্যাসিনির নামানুসারে সেই ফাঁকের নাম রাখা হয়েছে 'ক্যাসিনির বিভাগ'। বাইরের পাঁশুটে সাদা বলটিকে বলা হয় 'A'-বলয় এবং ভেতরের উজ্জ্বল সাদা বলয়টিকে বলা হয় 'B'-বলয়।

এরপর 1838 সালে 'B'-বলয়ের ভেতরের দিকে আরও একটি বলয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। জার্মান জ্যোতির্বিদ গটফ্রেড গ্যালে'র আবিষ্কৃত ক্রেপ কাগজের মতো অস্বচ্ছ নীলচে ধূসর রঙের এই বলয়টির নাম রাখা হয় 'ক্রেপ' বা 'C'-বলয়। 1969 সালে ক্রেপ বলয়ের ভেতরের দিকে আরও একটি হাল্কা বলয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, নাম রাখা হয় 'D'-বলয়। এরপর 1979 সালে পাইয়োনিয়ার-11 গ্রহযান থেকে তোলা ছবিতে আরও দুটি বলয়—'E' এবং 'F'-বলয়ের খোঁজ পাওয়া যায়। মানে 1979 সালে শনির মোট ছ'টি বলয় আছে বলেই মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু তারপর ঘটে এক অদ্ভুত ঘটনা।

1980 সালের নভেম্বর মাসে ভয়েজার-1 গ্রহযান শনির পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় শনির যে ছবি তুলে পাঠায় তাতে দেখা যায় যে, তার বলয়ের সংখ্যা 6 বা 7 তো নয়ই, একশো বা দুশোও নয়। সেসব ছবিতে দেখা যায় যে, সব মিলিয়ে কয়েক হাজার নানা আকারের বলয় গ্রহটির চারপাশে ঘুরছে! এরপর 1981 সালের আগস্ট মাসে ভয়েজার-2 গ্রহযানের আরও উন্নত ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিতে দেখা গেল, মোট বলয়ের সংখ্যা হয়তো কয়েক লাখও হতে পারে। যে সব জায়গায় পৃথিবী থেকে দেখে ফাঁক আছে বলে মনে হত সেসব ফাঁকের মধ্যেও অসংখ্য সূক্ষ্ম বলয় আছে দেখা গেল। সবে মিলে শনির বলয়ের রূপটা হয়ে দাঁড়ালো অনেকটা একটা সূক্ষ্ম খাঁজ-কাটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত। অবশ্য সেটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো কঠিন নয়।

ভয়েজার গ্রহযান দুটি থেকে পাঠানো ছবিতে শনির বলয়ের মধ্যে অনেক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়লো। দেখা গেল যে, বলয়ের ওপর কিছু অংশে চাকার পাখি বা স্পোকের মত ছোপ ছোপ দাগ আছে যা বলয়ের সঙ্গে তাল রেখে ঘোরে না, বরং ঘোরে শনির চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে তাল রেখে। কিছু বলয়ের ক্ষেত্রে আবার দেখা গেল, সেগুলি যেন পরস্পরের সঙ্গে বিনুনি পাকিয়ে আছে। শনির বলয়ের এই সব অদ্ভুত আচরণ বিজ্ঞানীদের বেশ অবাক করে দিয়েছে। তাঁদের কাছে শনির বলয় যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

শনির বলয়গুলি কি দিয়ে তৈরী তা আজও জানতে পারা যায় নি। তবে পৃথিবী থেকে তোলা ছবি এবং গ্রহযান থেকে পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে যা জানতে পারা গেছে তা থেকে মনে হয় যে, সেগুলি মুখ্যতঃ বিভিন্ন সাইজের বরফের টুকরো দিয়ে তৈরী। আকারে সেগুলি মাত্র কয়েক মিলিমিটার থেকে নিয়ে কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। আবার ঐ বরফের টুকরোর সমাবেশ সব জায়গায় একরকম নয়, কোথাও কম কোথাও বেশি, যার ফলে বলয়গুলির ঘনত্বও আলাদা আলাদা দেখায়।

ঘনত্বের তারতম্যের ভিত্তিতে শনির বলয়গুলিকে সাতটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। মূলগ্রহের সবচেয়ে কাছের বলয়টি হলো 'D'-বলয়। তারপর আছে 'C' বলয় যা প্রায় 17,5000 কিলোমিটার চওড়া। এরপর প্রায় 1800 কিলোমিটার এলাকায় কোন বলয় নেই। তারপর আছে 25,340 কিলোমিটার চওড়া 'B'-বলয়। 'B'-বলয়ের পর আছে প্রায় 5000 কিলো মিটার চওড়া 'ক্যাসিনির বিভাগ। এর পরে প্রায় 13,900 কিলোমিটার চওড়া 'A'-বলয়। 'A'-বলয়ের পরে আছে প্রায় 4000 কিলোমিটার চওড়া ফাঁকা এলাকা যাকে বলা হয় 'পায়োনিয়ার বিভাগ'। পায়োনিয়ার বিভাগের পরে আছে খুবই ক্ষীণ একটি বলয়, নাম 'F'-বলয়। এরপর প্রায় 10,000 কিলোমিটার দূরে আছে-'G'-বলয়। এটি চওড়ায় প্রায় 3,600 কিলোমিটার। শনির সবচেয়ে বাইরের বলয়

হলো প্রায় 1,20,000 কিলোমিটার চওড়া 'E'-বলয়। এই বলয়টি খুবই ক্ষীণ!

শনির এইসব বলয়গুলি যতই চওড়া হোক না কেন, সেগুলি কিন্তু খুবই পাতলা। সম্ভবতঃ সেগুলি কোথাওই 10-15 কিলোমিটারের বেশি পুরু নয়।

এখন তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, শনির ঐ বলয় এলো কোথা থেকে? এর উত্তর সঠিক কারো জানা নেই, তবে এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে। 1800 সালে এক ফরাসী বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড রচি গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, একটি গ্রহের চারপাশে প্রদক্ষিণ-শীল উপগ্রহ যদি মূলগ্রহের ব্যাসার্ধের 2'45 গুণ দূরে এসে পড়ে তা হলে. উপগ্রহটি মহাকার্ষের প্রচণ্ড শক্তির ক্রিয়ায় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে বলয়ে রূপান্তরিত হয়। গ্রহের ব্যাসার্ধের 2·45 গুণ দূরের ঐ সীমানাকে বলা হয় হয় 'রচির সীমানা'। কোনও গ্রহের উপগ্রহ যদি ঐ রচির সীমানার মধ্যে এসে পড়ে তা হলে তা ভেঙেচুরে বলয়ে রূপান্তরিত হয়ে থাকে—এটাই ছিল রচির ব্যাখ্যা। কিন্তু আজ এই ব্যাখ্যা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। শনির সদ্য খুঁজে-পাওয়া অন্ততঃ তিনটি উপগ্রহের বেলায় দেখা গেছে সেগুলির দূরত্ব রচির সীমানা থেকেও অনেক কম। সুতরাং শনির ঐ বলয় উদ্ভব কিভাবে হলো তা আজও অজানা রয়ে গেছে।

শনির বলয়কে বাদ দিলে মূলগ্রহটিকে দেখতে প্রায় বৃহস্পতির মতোই। আয়তনে অবশ্য শনি বৃহস্পতির চেয়ে ছোট। শনির আয়তন পৃথিবীর তুলনায় প্রায় 750 গুণ, সে তুলনায় বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে 1300 গুণ বড়। বৃহস্পতির মতো শনিও প্রধানত গ্যাসীয় পদার্থের তৈরী এবং সেজন্যে তার ঘনত্বও খুব কম। তবে বৃহস্পতির তুলনায় শনি অনেক হাল্কা। বৃহস্পতির ঘনত্ব হলো 1·3। সে তুলনায় শনির ঘনত্ব মাত্র 0·7। অর্থাৎ শনি হলো জলের চেয়েও হাল্কা! যদি কোনও অতিকায় জলের সমুদ্রে শনিগ্রহকে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে বিশাল ঐ গ্রহটি ডুবে যাবে না, বরং রাবারের বলের মত ভাসবে! শনি হলো সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে হাল্কা গ্রহ।

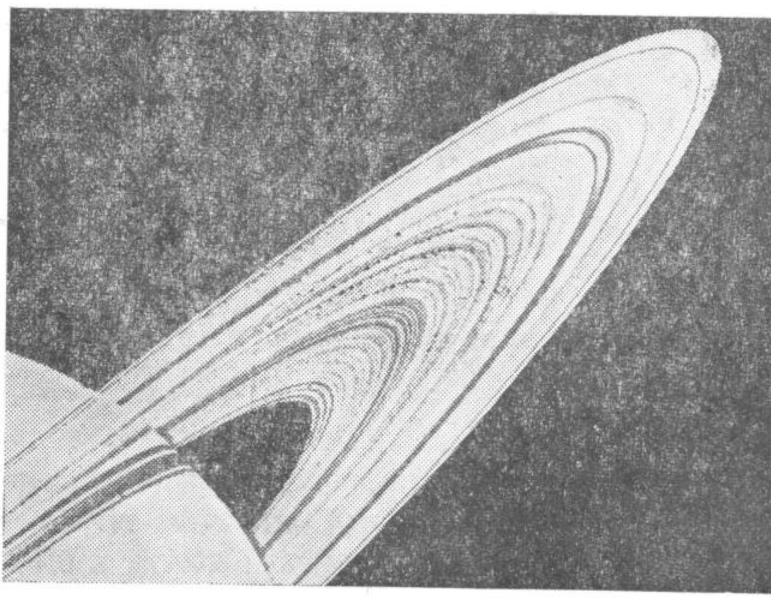

ভয়েজার গ্রহযান থেকে তোলা শনির বলয়

বৃহস্পতির সঙ্গে শনির আর একটা সাদৃশ্য হলো তার দ্রুত আহ্নিক গতি। নিজের অক্ষে একবার ঘুরতে শনির সময় লাগে মাত্র 10 ঘণ্টা 39·4 মিনিট। এর ফলে বৃহস্পতির মতো শনির বিষুব অঞ্চলও তার মেরু অঞ্চলের তুলনায় ফোলা। শনির বিষুবীয় ব্যাস হলো 1,20,000 কিলোমিটার আর তার মেরু অঞ্চলের ব্যাস 1,08,000 কিলো-মিটার। দুটির মধ্যে তফাৎ 12,000 কিলোমিটারের।

সূর্য থেকে শনির গড় দূরত্ব হলো 142 কোটি 80 লক্ষ কিলোমিটার। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে শনির সময় লাগে 29·46 বছর। তবে প্রতি 378 দিন অন্তর শনি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে। সে সময় তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 119 কোটি 70 লক্ষ কিলোমিটার। শনি যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে সরে যায়, তখন এই দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় 165 কোটি 40 লক্ষ কিলোমিটার।

দূরবীনে শনির গোলকটিকে প্রায় বৃহস্পতির মতোই দেখায়। বৃহস্পতির মতো শনির গায়েও রঙ-বেরঙের

শনির উপগ্রহ

উপগ্রহ	ব্যাস	শনি থেকে দূরত্ব	আবিষ্কারের তারিখ
15	80 কি. মি.	1,36,000 কি. মি.	1980
16	50 কি. মি.	1,38,200 কি. মি.	1981
14	30 কি. মি.	1,39,400 কি. মি.	1980
13	220 কি. মি.	1,41,700 কি. মি.	1980
11	120 কি. মি.	1,51,400 কি. মি.	1980
12	180 কি. মি.	1,51,450 কি. মি.	1980
য়ান্নুস	300 কি. মি.	1,60,000 কি. মি.	1967
মিমাস	500 কি. মি.	1,85,500 কি. মি.	1789
এনসেলাভাস্	600 কি. মি.	2,38,000 কি. মি.	1789
টেথিস	1040 কি. মি.	2,94,700 কি. মি.	1684
দিওন	1120 কি. মি.	3,78,000 কি. মি.	1684
17	80 কি. মি.	3,78,000 কি. মি.	1981
রিয়া	1530 কি. মি.	5,28,000 কি. মি.	1672
টাইটান	5117 কি. মি.	12,23,000 কি. মি.	1655
হাইপারিয়ান	225 কি. মি.	14,84,000 কি. মি.	1848
আয়াপিটাস	1440 কি. মি.	35,63,000 কি. মি.	1671
ফিবি	240 কি. মি.	1,29,60,000 কি. মি.	1898

যে সব গ্রহযান শনিগ্রহ অভিমুখে পাঠানো হয়েছে

	গ্রহযান	যাত্রা শুরু	পৌঁছানোর তারিখ	কি কি করেছে
1.	পায়োনিয়ার-11	6 এপ্রিল 1973	1 সেপ্টেম্বর 1979	শনিগ্রহের 20,800 কি. মি. দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তিনটি নতুন উপগ্রহের সন্ধান পায়। একটা নতুন বলয়ের সন্ধানও গ্রহযান থেকে তোলা ছবিতে পাওয়া যায়। গ্রহযানের যন্ত্রপাতিতে শনিগ্রহের চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।
2.	ভয়েজার-1	5 সেপ্টেম্বর 1977	12 নভেম্বর 1980	শনিগ্রহের 77,000 কি. মি. দূর দিয়ে যাবার সময় বলয়ের গঠন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাঠায়। পায়োনিয়ার-11-এর খুঁজে পাওয়া তিনটি উপগ্রহ ছাড়াও আরও দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার।
3.	ভয়েজার-2	20 আগস্ট 1977	26 আগস্ট 1981	শনিগ্রহের 10,08,000 কি. মি. দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে ইউরেনাস ও নেপচুন অভিমুখে চলে যায়। গ্রহযানটি থেকে তোলা ছবিতে শনির আরও দুটি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়।

ডোরা দাগ দেখতে পাওয়া যায়। তবে শনিগ্রহে চাঞ্চল্য যেন একটু কম বলেই মনে হয়। আর ডোরার রঙগুলোও বৃহস্পতির তুলনায় অনেক হাল্কা। ভয়েজার গ্রহযান থেকে তোলা ছবিতে অবশ্য শনির বায়ুমণ্ডলেও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ভয়েজার-2 থেকে তোলা ছবিতে শনির দক্ষিণ গোলার্ধে প্রায় 11,200 কিলোমিটার লম্বা ডিমের মতো এলাকার সন্ধান পাওয়া গেছে, যা দেখতে অবিকল বৃহস্পতির লাল ছোপের মতো।

পায়োনিয়ার ও ভয়েজার গ্রহযান থেকে পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে পারা গেছে যে, বৃহস্পতির মতো শনিও মুখ্যত হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম গ্যাসের তৈরী। আর দুটি গ্রহের ভেতরের গঠনও সম্ভবত একইরকম। অর্থাৎ, শনির ভেতরটাও তরল গ্যাসের তৈরী আর তারও উপরিতল বলতে কিছু নেই। পৃথিবী থেকে যে অংশটা আমরা দেখতে পাই সেটা হলো শনির বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ।

বৃহস্পতির মতো শনির বায়ুমণ্ডলেরও উপরিভাগের তাপমাত্রা খুবই কম। ভয়েজার-2এর যন্ত্রপাতিতে বায়ুমণ্ডলের 40 কিলোমিটার নিচের তাপমাত্রা পাওয়া গেছে মাইনাস্ 185 ডিগ্রী সেলসিয়াস। তবে শনির ভেতরের তাপমাত্রা সম্ভবত খুবই বেশি। কারণ পায়োনিয়ার গ্রহযান থেকে মাপজোখ করে দেখা গেছে যে, শনি যে পরিমাণ শক্তি সূর্য থেকে গ্রহণ করে তার চেয়ে প্রায় তিনগুণ শক্তি যে মহাশূন্যে বিকিরণ করে। এখানেও বৃহস্পতির সঙ্গে শনির সাদৃশ্য অদ্ভুত।

বলয় ছাড়াও শনির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর উপগ্রহ সংখ্যা। আজ পর্যন্ত গ্রহটির 17টি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে 9টি হলো বড়ো বা মাঝারী সাইজের আর বাকি 8টি খুবই ছোট। 1980 সাল পর্যন্ত শনির মাত্র 10টি উপগ্রহের কথাই আমাদের জানা ছিল। 1980 সালের নভেম্বর মাসে ভয়েজার-1 গ্রহযান শনিগ্রহের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় যেসব ছবি তুলে পাঠায় তাতে আরও 5টি ছোট উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর 1981 সালে দ্বিতীয় ভয়েজার গ্রহযান আরও দুটি উপগ্রহের সন্ধান দেয়।

শনির উপগ্রহগুলির প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সবচেয়ে ছোট উপগ্রহটির ব্যাস মাত্র 30 কিলোমিটার। আবার সবচেয়ে বড় উপগ্রহ টাইটানের ব্যাস প্রায় 5120 কিলোমিটার, অর্থাৎ বুধগ্রহের চেয়েও বড়। এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। 1980 সালের আগে শনির টাইটানকেই সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ বলে ধরা হত। কারণ তখন ধারণা ছিল যে টাইটানের ব্যাস হলো 5000 কিলোমিটার। ভয়েজার-1 গ্রহযান এই ভুল ভেঙে দেয়। ভয়েজার থেকে পাঠানো ছবি ও তথ্য থেকে জানতে পারা যায় যে, টাইটানের ব্যাস আসলে 5117 কিলোমিটার। অর্থাৎ সে হলো বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমীড-এর চেয়েও ছোট। গ্যানিমীডের ব্যাস হলো 5220 কিলোমিটার।

টাইটানের নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে, যার প্রধান উপাদান হলো নাইট্রোজেন। টাইটানের উপরিতলে বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দেড় গুণ, সেখানে তাপমাত্রা পাওয়া গেছে মাইনাস 182 ডিগ্রী সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীদের ধারণা টাইটানের উপরিতল তরল অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডে ঢাকা।

অন্যান্য উপগ্রহগুলির মধ্যে 1120 কিলোমিটার ব্যাসের 'দিওন'কে দেখতে প্রায় আমাদের চাঁদের মতো। 1440 কিলোমিটার ব্যাসের উপগ্রহ আয়াপিটাসের বিশেষত্ব হলো এই যে, এর একটা দিক একেবারে সাদা, অপরদিকটা একেবারে কালো রঙের। কেন এমনটি হয়েছে তা অবশ্য বিজ্ঞানীদের জানা নেই। মিমাস নামক উপগ্রহটি আকারে খুবই ছোট, এর ব্যাস মাত্র 390 কিলোমিটার। কিন্তু এর ওপর এক বিরাট গহ্বর আছে, যার ব্যাস 100 কিলোমিটারেরও বেশি। আর একটি উপগ্রহ টেথিস, এর ব্যাস 1040 কিলোমিটার। এই উপগ্রহটির বিশেষত্ব হলো 750 কিলোমিটার লম্বা ও 60 কিলোমিটার চওড়া এক বিশাল গিরিখাত।

শনির উপগ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ হলো 1980 সালে আবিষ্কৃত 15 নম্বর উপগ্রহটি। শনির কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব মাত্র 1 লক্ষ 36 হাজার কিলোমিটার। সে তুলনায় সবচেয়ে দূরের উপগ্রহ 'ফিবি'র দূরত্ব হলো 1 কোটি 29 লক্ষ 60 হাজার কিলোমিটার। ফিবির আর একটা বিশেষত্ব হলো এই যে, এটি অন্য সব উপগ্রহ যেদিকে ঘোরে তার উল্টোদিকে ঘোরে।

1980 সালের পর শনির বলয়, তার গঠন ও উপগ্রহের সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা গ্রহটি সম্বন্ধে আমাদের পুরানো ধারণা প্রায় সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি শনিগ্রহ সত্যিই কত জটিল। গ্রহটি সম্বন্ধে অনেক রহস্যের সমাধান আজও পাওয়া যায় নি। ভবিষ্যতে গ্রহযান পাঠিয়ে আরও অনেক চমকপ্রদ তথ্য হয়তো পাওয়া যাবে।

(ছবি : ইউ এস আই এস)

7 ইউ, এফ্, কলেজ রোড, নিউ দিল্লী-1

খেলার নাম ঃ গোলকধাঁধা

সিদ্ধার্থ ঘোষ

এক আজগুবি দেশের গপ্প বলছি। যেখানে মানুষ ফুটবল খেলে না, ক্রিকেট খেলে না, লুডো ও তাস তো দূরের কথা। তারা শুধু মেতে থাকে অঙ্কের খেলা নিয়ে, সংখ্যা নিয়ে।

এই আজব দেশে আছে আজব একটা পার্ক। পার্কে গাছ নেই একটাও, শুধু মাটির উপর খোপ খোপ ঘর কাটা আছে। যেমন দেখছ ছবিটায় প্রচ্ছদের শেষ পাতায়। প্রত্যেকটা খোপে দ্যাখো একটা করে সংখ্যাও লেখা আছে।

এই পার্কে ঢোকামাত্র তোমাকে ওই খোপ কাটা-কাটা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। লক্ষ্য করে দ্যাখো ওই মাঝখানটার খোপটা কালো রঙ-করা আর তার মধ্যে লেখা আছে 3।

তা হলে কালো রঙের খোপের মধ্যে সাদায় লেখা 3-এর উপর চড়ে তো দাঁড়ালে। এবার ?

এবার তুমি—ওপরে বা নিচে, ডান বা বাঁ পাশে কিংবা কোণাকুণি (চারটে কোণ আছে) যে কোন দিকে সরল রেখা বরাবর তিন ঘর এগোতে পার। তার মানে তোমার সামনে আটটা পথ খোলা আছে। যে কোন পথে তিন ঘর এগোতে পার। শুধু তিন ঘর কেন? কারণ তুমি যে ঘর থেকে শুরু করছ সেখানে 3 লেখা আছে।

ধরা যাক্ তুমি বাঁ পাশে তিন ঘর সরে আসবে। তা হলে দ্যাখো তুমি 1 লেখা ঘরটায় পৌঁছে গেছ। এবার কি করবে? এবারও ঠিক আগের মতো ডান বা বাঁ পাশে, ওপরে বা নিচে, কিংবা কোণাকুণি চারটে পথের যে কোন একটা পথ ধরতে পার। কিন্তু হ্যাঁ, এবার মাত্র এক ঘর এগোতে পারবে। কেন বুঝতে পারছ নিশ্চয়? তুমি যে 1—লেখা ঘরে দাঁড়িয়ে আছ।

এইভাবে এগোতে এগোতে তোমাকে এমন একটা ঘরে পৌঁছতে হবে যেখানে এমন একটা নম্বর আছে যা তোমাকে নম্বর লেখা গোলকধাঁধার ঠিক এক খোপ বাইরে একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে যাবে। তা হলেই তুমি গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাবে।

কি আশ্চর্য ব্যাপার দ্যাখো— গোলকধাঁধার মধ্যে কোনো বেড়া নেই, পাঁচিল নেই, যে কেউ ছুটে বেরিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তা হলে তো আর নিয়ম মানা হয় না। আজব দেশের মানুষেরা নিয়ম ভাঙতে ভালবাসে না বলেই কিন্তু গোলকধাঁধার খেলায় এত মজা পায়।

তোমরাও খেলে দেখতে পার। কিন্তু 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে'র পাতাটা বড্ড ছোট বলে পার্কের মতো বড়সড় গোলকধাঁধা তৈরি করে দেওয়া গেল না। নিজেরা তো আর এইটুকু খোপের মধ্যে দাঁড়াতে পারবে না। তাই বলছি একটা পেন্সিল নিয়ে ভেবে নাও এই পেন্সিলটাই আসলে তুমি। এবার নিজে খোপের মধ্যে না ঢুকে পেন্সিলটার মুখটা ঠেকিয়ে ধরো মাঝখানের কালো খোপটায়।

কত তাড়াতাড়ি রেহাই মেলে দ্যাখো এবার।

নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য

ভৌতবিজ্ঞান (Physical Science)-এর সেরা বই

ডঃ অলক চক্রবর্ত্তী, ডি. এস. সি.

ও

অমিয়তোষ রায় লিখিত

বিজ্ঞান প্রবেশিকা

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ

[সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও ব্যবহারিক অংশ সহ]

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

ফোন ঃ ৩৪-৩১৫৭ * গ্রাম ঃ গ্রন্থাগার

ডিসেম্বর সংখ্যার লজিকের খেলা L-এর সম্বন্ধে : সিদ্ধার্থ ঘোষ

কোনো কোনো খেলাকে ইংরেজিতে বলে Logic game—লজিকের খেলা। যুক্তির খেলা বলে তার বাংলা করা যায়, কিন্তু তাতে সবটা বোধ হয় বুঝিয়ে বলা হয় না। যুক্তি শব্দটা আসলে ইংরেজি reason-এর প্রতিশব্দ।

লজিকের খেলা যে-কোন খেলার মতোই মজাদার হলেও সাধারণ খেলার সঙ্গে তার অনেক তফাৎও আছে। সাধারণ খেলাতেও যুক্তিবুদ্ধি খাটিয়ে চাল দিতে হয়, কিন্তু লজিকের খেলায় যুক্তির ব্যবহার আরো বেশি।

লজিকের খেলায় চাল দেবার আগে বিভিন্ন চালের মধ্যে কোন্ চালটা সবচেয়ে ভাল সেটা বিচার করা যায়। দাবার খেলাতে দারুন বুদ্ধি লাগে, ভাল খেলোয়াড়ের প্রতিটি চালের পিছনেই থাকে যুক্তি। শত্রুপক্ষ কি কি চাল দিতে পারে আগে থেকে বিচার করে তবে নিজের ঘুঁটি চালতে হয়। নামকরা দাবাড়ু মানেই এমন একজন যে আগে থেকে শত্রুপক্ষের বহু চাল ও তার যে-কোন চালের পাল্টা চালের কথা ভেবে নিয়ে তবে নিজের চাল দেয়। দাবা খেলাকে কিন্তু আমরা লজিকের খেলা বলিনা, কেননা এতে বিভিন্ন চাল দেওয়ার এত রকম সম্ভাবনা থাকে যে কোন্ চালটা শেষ পর্যন্ত জেতার পক্ষে সেরা প্রমাণিত হবে, প্রথম থেকে তার হদিশ মেলা ভার। এমন কি কম্পিউটারও, ইলেকট্রনিক মগজও, অনেক সময় তার থই পায় না।

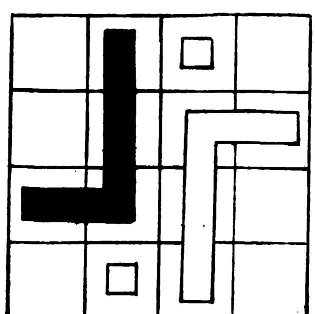

A

লজিকের খেলা—L নিয়ে তোমরা নিশ্চয় নাড়াচড়া করেছ। ভেবেচিন্তে চাল না দিলেও দু'জনে মিলে এই খেলা চালানো যায়। কিন্তু সত্যিকার মজাটা পেতে হলে সবসময় চেষ্টা করতে হবে প্রতিপক্ষের চাল সম্বন্ধে মনে মনে হিসাব করতে ও সেই মতো নিজের চাল দিতে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ধরো খেলতে খেলতে এক সময়ে L-খেলার বোর্ডের চেহারাটা দাঁড়ালো A-ছবির মতো।

মনে করো তুমি কালো ঘুঁটিটা নিয়ে খেলছ এবং এবার তোমার চাল দেওয়ার পালা। বোর্ডের অবস্থাটা খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, কালো ঘুঁটিটা চালার তিনটে জায়গা আছে। সেই তিনটে জায়গার ছবিই নিচে ছেপে দেওয়া হলো (চৌকো ঘুঁটি নাড়ানো হয় নি)—B, C ও D ছবি

এই ছবি তিনটে পরীক্ষা করে বলতে পারো কি এর মধ্যে কোন্ চালটা সবচেয়ে ভাল?

আগেই বলেছি কোন চালটা সব চেয়ে ভাল জানতে হলে ভেবে দেখতে হবে এই চালটা দিলে প্রতিপক্ষ কি চাল দিতে পারে।

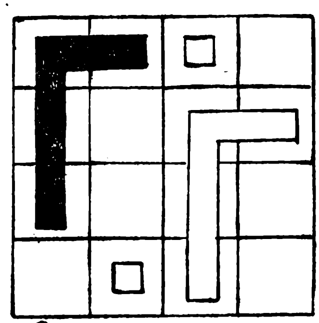

B

ধরো তুমি B ছবির মতো চাল দিলে। তোমার প্রতিপক্ষ তখন সাদা ঘুঁটি সরিয়ে E ছবির মতো চাল দিল। ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো এবার বুঝতে পারছ কি? কালো ঘুঁটির আর নড়ার জায়গা রইলো না। তার মানে

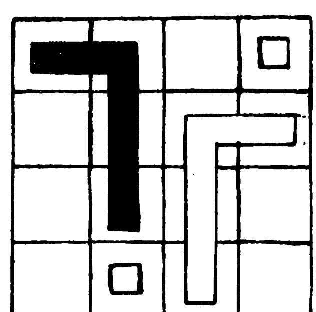

C

তুমি যদি B-ছবির মতো চাল দাও আর তোমার প্রতিপক্ষ বুদ্ধি করে E-ছবির মতো চাল দেয়, তা হলেই তুমি হেরে যাচ্ছ।

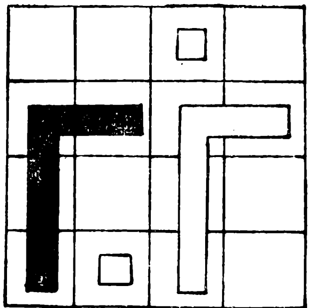

D

এবার C-ছবিটার কথা চিন্তা করা যাক। তুমি C-ছবির মতো চাল দিলে বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ F-ছবির মতো চাল দেবে। এবারও সেই এক অবস্থা। সাদা ঘুঁটিটা ও একটা চৌকো ঘুঁটি সরিয়ে F-ছবির মতো

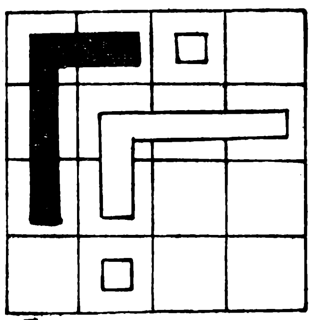

E

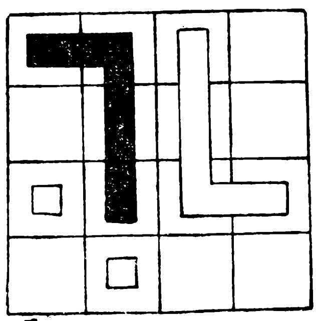

F

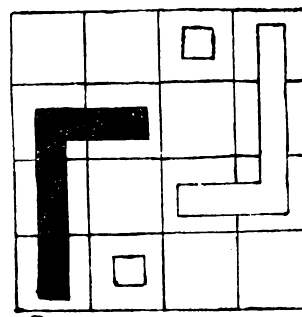

G

জায়গায় বসালে তোমার আর কালো ঘুঁটি নাড়ার জায়গা থাকবে না। তারমানে C-ছবির মতো চাল দেওয়াও তোমার পক্ষে বোকামি হবে।

তা হলে বাকী রইলো D-ছবির চাল। বুদ্ধিমান প্রতি-পক্ষ এবার ধরো G-ছবির মতো চাল দিল—

এবার কিন্তু তোমার চাল দেওয়ার সুযোগ আছে। এক ঘর ওপরে উঠে যেতে পার কিংবা ঘুঁটিটা উল্টে নিয়েও দু'ভাবে বসাতে পার।

বুঝতেই পারছ তা হলে যে, B, C ও D—এই তিনটে চালের মধ্যে D-চালটাই সবচেয়ে ভাল।

এইভাবে প্রত্যেকটা চাল দেওয়ার আগে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য চালের কথা মনে মনে হিসেব করে নিয়ে যদি চাল দাও তো দেখবে খেলাটা কিরকম জমে উঠেছে।

আরেকটা কথা বলে দিই—সোজা কোন হিসেব নেই খেলাটা জেতার। তবে যদি প্রথমে একা-একা বসে ঘুঁটি সাজিয়ে দেখে নাও কোন্ কোন্ অবস্থায় আর ঘুঁটি নাড়ানোর কোনো জায়গা থাকে না এবং প্রতিপক্ষকে সেই অবস্থায় ফেলবার চেষ্টায় খেলা চালাও, তা হলে নিশ্চয় ভাল ফল পাবে।

এবার বুঝতে পারছ তো শুধু L-এর খেলা নাম না দিয়ে কেন নাম দেওয়া হয়েছে— লজিকের খেলা-L!

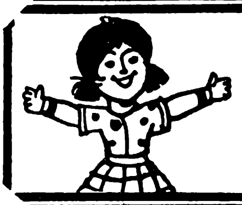

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসায় ডিসেম্বর 82 সংখ্যার দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

কলকাতা

তন্ময় সাল্‌দ, লক্ষ্মীনারায়ণ শীল, শুভাশিষ আতর্থী, মনীন্দ্রনাথ পাত্র, ইন্দ্রনীল ঘোষ, অনুপম ভট্টাচার্য, স্বরূপ কুমার চ্যাটার্জী, রামকৃষ্ণ পারিখ, মৃণাল পারিখ, ইন্দ্রজিৎ বর্মন, সত্যজিৎ বর্মন, সমরজিৎ বর্মন, দুর্গা মাথুর, রিঙ্কু পোদ্দার, মিঠু মুখার্জী, শর্মিলা দে সরকার, ভাগীরথী মৃদলী, নিভা বিশ্বাস, পিকো ব্যানার্জী, মিলি সেনশর্মা, প্রবীর ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল ঘোষ, মলয় দাশ, তন্দ্রা দাশ, অজয়েশ ঘোষাল, প্রণবকুমার সরকার।

24-পরগণা

সৌমিত্র মজুমদার, অলকেশ চক্রবর্তী, সৌমেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিপ্লব ভট্টাচার্য, দীপক চক্রবর্তী, প্রতিমা ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পারুল মজুমদার, বিনয় ভট্টাচার্য, মলয় ভট্টাচার্য, অপূর্ব চক্রবর্তী, তপন চক্রবর্তী, শুভেন্দু দাস, অসীম সমাজদার, মানস বসু, সমীরণ বিশ্বাস, স্মৃতিকণা কর, সুদীপ চৌধুরী, সন্দীপন বিশ্বাস, মদন ঘোষ।

হাওড়া

রেখা সামন্ত, শিল্পশ্রী সেন, নন্দিতা চৌধুরী, সৌমেন পাল, তরুণ সিংহ, দুলালচন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপ্তি ভট্টাচার্য, দেবকুমার দে, বন্দনা সরকার, সুব্রত দত্ত, গৌতম পাণ্ডা, রাণা গুপ্ত।

হুগলী

সুনীতা ব্যানার্জী, সুব্রত দত্ত, অপর্ণা ভট্টাচার্য, পার্থ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, তারকনাথ দে, অনিলকুমার দে, রণজিৎ দে, দেবাশিস চক্রবর্তী, নীলমণি দাস, শর্মিষ্ঠা অধিকারী, সৌরভ সরকার, সুশান্তকুমার পাড়ুই, প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, তাপস, মানস, চঞ্চল কুণ্ডু, প্রত্যুষ চ্যাটার্জী, সুরজিৎ পাল, অম্বরজিৎ রায়, অভিজিৎ রায়, মৌসুমী মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার পাল।

বর্ধমান

রাজনারায়ণ হাজরা, গোপাল পোদ্দার, সন্দীপ পোদ্দার, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল সেন, দিলীপ গোস্বামী, কল্যাণ সেন, নীলিমা সেন, পুতুল সেন, তরুণকুমার সিংহ, অরুণকুমার সিংহ, বরুণকুমার সিংহ, অমিত চট্টোপাধ্যায়, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, গৌতম সাহা, সুজাতা সাহা, সাধনা ব্যানার্জী, সান্ত্বনা ব্যানার্জী, স্বরূপ ব্যানার্জী, বিষ্ণুপদ নন্দী, সমরেন্দ্র মাজি, সেখ সামসুদ্দিন, দিব্যেন্দু গুহ, মল্লিকা গুহ, প্রবীরকুমার দে, সব্যসাচী রায়, চিন্তাহরণ রায়, সুরজিৎকুমার কুণ্ডু।

বীরভূম

দীপনারায়ণ দত্ত।

বাঁকুড়া

সত্যপ্রিয় রায়, শ্যামল, অজয়, লক্ষ্মী, রুমা কুণাল, বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ ভুঁই, সোমা সিংহ।

মেদিনীপুর

হিমাদ্রি পাল, অরুণাভ সোম, সংঘমিত্রা সোম, অমিতাভ সোম, রুমা মাইতি, শুভ্রাংশুশেখর মাইতি, পার্থপ্রতিম মাইতি, তুষার দত্ত, দেবশ্রী, মানসী, বনশ্রী, তপশ্রী, অনুশ্রী ভট্টাচার্য, অরূপকুমার ভট্টাচার্য, চন্দন দাস, নন্দন দাস, সর্বাণী ষড়ঙ্গী, দেবজ্যোতি ষড়ঙ্গী, দীপক ষড়ঙ্গী, ছন্দা ষড়ঙ্গী, কঙ্কনকুমার পাখি, রঞ্জনকুমার পাখি, বিকাশচন্দ্র বিশ্বাস, অমিয়কান্তি বিশ্বাস, প্রসিতকুমার সরকার, দেবাশিস মণ্ডল, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, তুষার কান্তি পাল, চিন্ময় সিংহ তাপস মণ্ডল, অরুণকুমার পাল, মৃণালপ্রসাদ পাল, মৃদুলপ্রসাদ পাল, মকুল পাল, চন্দন কুমার পাণি, প্রভাতকুমার গিরি।

নদীয়া

বিশ্বদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস কুণ্ডু, হিমাদ্রি আদিত্য চৌধুরী, দেবাশীষ কুণ্ডু, সুশীলকুমার কবিরাজ, সুশান্ত কবিরাজ, প্রশান্তকুমার কবিরাজ, শ্যামল বিশ্বাস, স্বাগতম নাথ, হরিমোহন নাথ, যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল, বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, সুষমা বিশ্বাস, নমিতা মণ্ডল, সুলতা মণ্ডল।

মুর্শিদাবাদ

চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, শুভাশীষ মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার সাহা, সুশীলকুমার ছাড়ের, প্রেমলতা ছাড়ের, তরুণকুমার দে, পল্লব চট্টোপাধ্যায়, সিমীলিতা চট্টোপাধ্যায়, গীতা চট্টোপাধ্যায়, মিনতি চট্টোপাধ্যায়।

মালদা

তাপস চক্রবর্তী, আশীষ চক্রবর্তী, সন্দীপ চক্রবর্তী, সরিৎকুমার দাস, দেবব্রত রায়।

জলপাইগুড়ি

জয়জিৎ লাহিড়ী।

পশ্চিমদিনাজপুর—সুব্রত মল্লিক।

পুরুলিয়া—ভৈরব পাল।

আসাম : ডিগবয়—সুব্রতকুমার দে।

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ— অসুখ করলে আমাদের শরীরে তাপ বেড়ে যায়, বা জ্বর হয় কেন ?

মালবিকা বসু, 22, ঈশ্বর মিল লেন, কলকাতা-6

উঃ—শরীরে সর্বদাই একটা তাপ থাকে। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি সেগুলি জারিত হয়ে কর্মক্ষমতার প্রয়োজন মেটায়। তারই কিছু অংশ তাপে পরিণত হয় এবং শরীরের সাধারণ অবস্থার তাপমাত্রা বজায় রাখে। এই তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে। এই সীমার (98·4°F) উপর গেলে বলা হয় জ্বর।

তাপমাত্রার সাম্য বজায় রাখতে শরীরের অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রক্রিয়া কাজ করে। যেমন পেশী সঞ্চালন, বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া, স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির রস ইত্যাদি।

এই সব স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে যদি কোনো কারণে বিঘ্ন ঘটে তা হলে তাপসাম্য রাখার কার্যক্রম ভারসাম্য হারায় বলে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়, বা জ্বর হয়।

প্রঃ—পৃথিবী মহাশূন্যে এক জায়গার স্থির হয়ে থাকে না কেন ?

সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরবিন্দ নগর, জলপাইগুড়ি

উঃ—সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবী তার চারদিকে এবং নিজস্ব অক্ষের ওপর আবর্তিত হয়। মহাশূন্যে কোনো গ্রহ-উপগ্রহই স্থির হয়ে থাকতে পারে না। সূর্যও স্থির নয়, পৃথিবীও নয়। জন্মলগ্ন থেকেই তারা আবর্তিত হচ্ছে এবং কোনো সময়েই তাদের পক্ষে স্থির হয়ে থাকা সম্ভব নয়।

প্রঃ—মাথায় আঘাত লাগলে ফুলে ওঠে কেন ?

অরিন্দম চক্রবর্তী, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা

উঃ—আঘাত লাগলে শরীরের যে কোনো স্থানই ফুলে যেতে পারে। শরীরের কোষের আবরণের ভেদ্যতা অনুযায়ী কিছু কিছু রস কলার মধ্যে নিঃসৃত হয়। সেই রস লাসিকা নালী দিয়ে হৃদযন্ত্রের দিকে ফিরে যায়। আঘাত লাগলে ত্বকের নিচের কোষকলাগুলি থেঁতলে যায়। তাতে কোষের আবরণের ভেদ্যতা বিনষ্ট হয়। ফলে কোষকলা থেকে অস্বাভাবিক রস নির্গত হয় এবং লাসিকানালী সত্বর তাকে বহন করে নিয়ে যেতে অপারগ হয়। এই অবস্থায় স্থানটি স্ফীত হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

অমরনাথ রায়

1. আদর্শ ভোল্টমিটারের রোধ কত হওয়া উচিত ?
2. কি ধরনের জলজ প্রাণীর দেহে কোনপ্রকার রেচন অঙ্গ থাকে না ?
3. শিরার রক্তের রঙ কেমন হয় ?
4. কফি বীজে কোন্ উপক্ষার থাকে ?
5. পাখির পালকের এবং মাছের চামড়ার বর্ণ নিয়ন্ত্রিত করে কোন্ হর্মোন ?
6. জীববিজ্ঞানে ঝিঁঝিপোকা কি নামে পরিচিত ?
7. ভিটামিন H-এর অপর নাম কি ?
8. পোলিও রোগের টিকার আবিষ্কর্তা কে ?
9. কোন্ শ্রেণীর খর জলকে ফুটিয়ে মৃদু করা যায় ?
15. 'চিলি সল্টপিটার'-এর আণবিক সংকেত কি ?
11. 'ওয়াটার গ্লাস' জিনিসটা কি ?
12. পর্যায় সারণীয় তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে কোন্ মৌল দিয়ে ?
13. বিভব প্রভেদকে কোন্ এককে প্রকাশ করা হয় ?
14. আলোকতরঙ্গ ও শব্দতরঙ্গের মধ্যে কার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় ?
15. কোন গ্যাসের মধ্যে চাপের উৎপত্তি হয় কি-ভাবে ?
16. কোন্ প্রজাপতি শুকনো পাতার আকার ধারণ করে অভিযোজনের উদ্দেশ্যে ?

(উত্তর পরবর্তী সংখ্যায়)

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার উত্তর)

1. তড়িৎ-প্রবাহ বেশীক্ষণ হয় 2. স্রোতের বল কাজ করে 3. পরমাণু ক্রমাঙ্কের উপর 4. নোবেল পুরস্কারে ভূষিত বিজ্ঞানী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা (মার্কিন নাগরিক) 5. 'জিন' বলে 6. চন্দ্র 7. 13 জোড়া বা 62টি 8. 24টি 9. চর্মের দ্বারা 10. অভিস্রবণ পদ্ধতিতে 11. স্যার আইজাক নিউটন 1'. 206টি 13. Indian Space Research Organisation 14. বিকিরণ পদ্ধতিতে 15. 4 ডিগ্রী সেলসিয়াস 16. হ্যাঁ, প্রযোজ্য।

নিজে কর

তরঙ্গের ব্যতিচার

মনোজ পিল্লাই ও সুজয় ঘোষ

একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং অপরিবর্তিত দশান্তরে (phase difference) যদি দুটি বা তার বেশি তরঙ্গমালা একই দিকে চলতে থাকে, তা হলে তাদের উপরিপাতন (superposition) হয়। এর ফলে কোন কোন বিন্দুতে লব্ধ বিস্তার সর্বোচ্চ এবং কোথাও সর্বনিম্ন হয়। এই ঘটনাকেই তরঙ্গের ব্যতিচার (interference of waves) বলে অভিহিত করা হয়।

ব্যতিচার প্রক্রিয়াকে সহজভাবে উপস্থাপিত করাই এই প্রকল্পটির লক্ষ্য। কাঁচের ভূমিযুক্ত একটি আয়তক্ষেত্রাকার কাঠের চৌবাচ্চা বানানো হলো এবং সেই চৌবাচ্চাটিকে

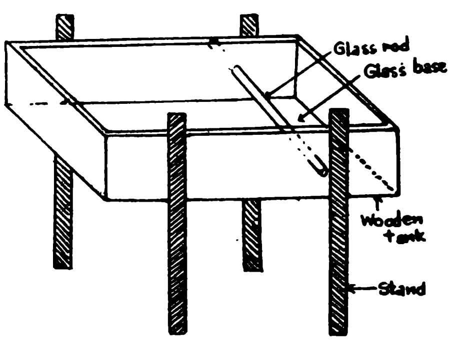

THE TANK (Fig-1)

কতগুলো কাঠের খুঁটির উপর দাঁড় করানো হলো (Fig-1)। কাঁচের প্লেটটির ঠিক উপর পর্যন্ত একটি কাঁচের নল রাখা হলো এবং সেই নল থেকে এক টুকরো কাঠ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এই কাঠের সঙ্গে আটকানো রইলো একটি মিনি-ইলেকট্রিক মোটর এবং দুটি নিম্নমুখী, কর্কযুক্ত লোহার

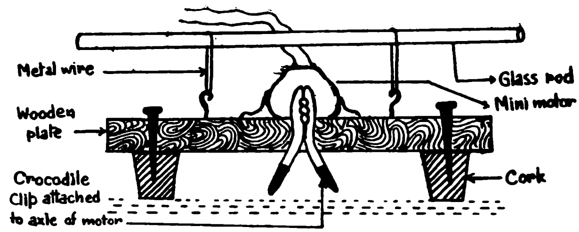

APPARATUS HUNG FROM GLASS ROD (Fig-2)

পেরেক (Fig-2)। এবার চৌবাচ্চাটির মধ্যে ধীরে ধীরে জল ঢালা হলো এমনভাবে, যাতে কর্ক দুটো ঠিক স্থির জলসীমা স্পর্শ করে। মোটারটিকে ব্যাটারীর সঙ্গে লাগানো হলো এবং সেটি সরল দোলকগতিকে কাঁপতে আরম্ভ করলো। এর ফলে কর্ক দুটি তির্যক জলতরঙ্গের দুটি সংলগ্ন-উৎস হিসেবে কাজ করলো (সমবিস্তার এবং সমতরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জলতরঙ্গ)। এই জলতরঙ্গের উপর একটি নির্দিষ্ট ব্যতিচার সৃষ্টি হলো—চৌবাচ্চাটিকে মাঝখানে রেখে যদি উপর থেকে আলো ফেলা যায় এবং নিচে পর্দা রাখা যায়, তা হলে

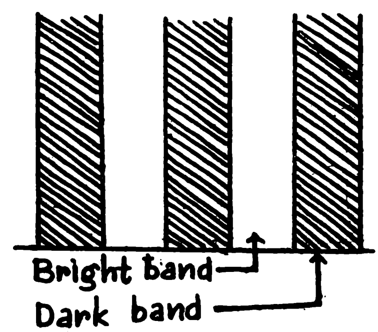

INTERFERENCE BANDS (Fig-3)

ব্যতিচারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটি বিশেষ ধরনের সাদা এবং কালো পাড় (bond) পাওয়া যায়।

মূল ইংরেজি রচনা ঃ মনোজ পিল্লাই (মাধ্যমিকে প্রথম 1982)। অনুবাদ ঃ সুজয় ঘোষ (মাধ্যমিকে প্রথম 1981)। এরা দুজনেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র।

পরিচিত পাখী

রাকা সাহা

(প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত)

গৃহস্থের বাড়িতে না ডাকা অতিথি হলো চড়াই পাখী। কিছুদিন আগে জলের বালতিতে একটা বাচ্চা চড়াই পড়েছিল। আমি তাকে বের করে বসবার ঘরে রাখলাম। ডানা ভিজে যাওয়ায় সে উড়তে পারছিল না। প্রথমে সে আমাদের ভয় পেয়ে সরে যাচ্ছিল। পরে খিদে পাওয়ায় পোষ মেনে, আমাদের হাত থেকে চালডালের দানা খেতে লাগলো। ওর নামকরণ নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধলো। মা-বাবা, ভাই, আমি আলাদা-আলাদা নাম দিলাম। অসুবিধা হওয়ায় আমরা সবাই তাকে 'চুচু' বলে ডাকতাম। সে এক মিনিটও স্থির হয়ে বসত না। কখন সোফায়, পর মুহূর্তে আলমারীতে গিয়ে বসত। নয়তো বাড়িময় মনের আনন্দে কিচির-মিচির করে উড়ে বেড়াত। জানলায় জালের দরুন পালাতে পারছিল না।

একদিন দুপুরবেলা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সে জানলার কাঁচ এবং জালের মধ্যে আটকে গেল। আমরা চেষ্টা করেও তাকে বের করত না পারায়, নিচের মেয়েটা কায়দা করে বাইরে উড়িয়ে দিল। ছানাটা মনের আনন্দে কিচির মিচির করে স্বচ্ছ নীল আকাশে উড়ে মা-বাবার কাছে চলে গেল। আমার মনও ওর পিছনে উড়ে গেল। ভাবলাম যে ও এতদিন আমাদের আনন্দ দিয়েছে এখন ওকে ফিরে পেয়ে ওর মা-বাবা আনন্দিত হবে।

চড়াই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; গৃহস্থ চড়াই এবং হলুদ-গলা চড়াই। গৃহস্থ চড়াইয়ের ঘাড়, গলা, পিঠ এবং কাঁধের কাছ বাদামী রঙের হয়, বুকের কাছ সাদা, লেজ খয়েরী এবং বাদামী রঙের হয়। চোখ থেকে ঠোঁট পর্যন্ত কালো রঙ দেখা যায়। হলুদ-গলা চড়াই-এর গলা হলুদ রঙের হয়। চড়াই এক সঙ্গে চার পাঁচটা ছাই রঙের ডিম পাড়ে। এদের বাসা নেকড়া এবং খড়কুটো দিয়ে তৈরী। এরা সব দেশেই পাওয়া যায়। হিমালয় পর্বতের ঠাণ্ডা আর রাজস্থানের মরুভূমির গরম তাদের কাছে এক।

চড়াই পাখীর সাহস, স্বাধীন জীবন আমায় প্রভাবিত করে। ইচ্ছে হয় চড়াই হয়ে কিচির-মিচির শব্দ করে নীল আকাশে উড়ে যাই।

ষষ্ঠ শ্রেণী, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, কোটা (রাজস্থান)

কাক ডাকে কা-কা

পীযূষকুমার চক্রবর্তী

(দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)

শালিক কি চড়াই, টিয়া কি ময়না সর্বত্র আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু বাড়ির আঙিনায়, হাটে-বাজারে, ইষ্টিশানে সব জায়গাতেই কাকের দেখা মেলে। শিশু যে পাখিটিকে প্রথমে পাখি বলে চিনতে শেখে, তা বোধ হয় কাক। তাই কি যোগীন্দ্রদাদু শিশুদের অ-আ শেখাবার জন্যে লিখেছিলেন—

কাক ডাকে কা—কা।
আগে অ পরে আ ॥

সচরাচর দু'রকমের কাক চোখে পড়ে, পাতি কাক ও দাঁড় কাক। পাতি কাকের পেট ও গলার রঙ ধূসর; পাখা ও মাথা কালো রঙের। দাঁড় কাক আগাগোড়া মিশকালো। পাতি কাক লেজ সমেত প্রায় 45 সেঃ মিঃ লম্বা; পাতি কাকের চাইতে দাঁড় কাক সামান্য লম্বা, হৃষ্ট-পুষ্টও বটে।

কাকের কণ্ঠস্বর বড়ই কর্কশ। কবি তাই লিখেছেন—
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে।

কাক প্রকৃতির ঝাড়ুদার। যেখানে যত মরা, পচা, নোংরা জিনিস থাকে কাক খেয়ে সাফ্ করে ফেলে। গাছে ফল পাকবার জো নেই। মানুষের নজরে পড়ার আগেই কাকে ঠুকরে খাবে। কফ, সিকনি থেকে শুরু করে হেন জিনিস নেই যে কাক খায় না। কাক সর্বভুক।

একতায় কাকের জুড়ি নেই। কাক দল বেঁধে গাছের ডালে বসে ঘুমোয়। কোন বিপদে পড়ুক; কা—কা রবে কত কাক সেখানে এসে জুটবে। তবে ডিম পাড়ার সময় কাক আলাদা-আলাদা বাসা বাঁধে। কাক বাসায় একবারে চার-পাঁচটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি নীলাভ সবুজ, তাতে বাদামী রঙের ছোপ।

চুরির চাতুরিতে কাক বড়ই ওস্তাদ, তেলের বাটি, সাবানের টুকরো মায় খেলনাটি পর্যন্ত কাক চুরি করে নিয়ে পালায়। কিন্তু এত বুদ্ধি থাকলে হবে কি! কোকিলের কাছে হার মানে। কোকিল কাকের বাসায় ডিম রেখে পালায়। কাক সেই ডিমে তা দিয়ে বাচ্ছা ফোটার আগে বুঝতেই পারে না যে, সেটি তার নিজের ছানা নয়। একেই বলে 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি'।

ষষ্ঠ শ্রেণী, চুঁচুড়া দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাই স্কুল, হুগলী

পরিচিত পাখি

শান্তিময় রায়

(তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)

আমাদের দেশে নানারকম পাখী দেখা যায়। তার মধ্যে বেশ কিছু আমাদের পরিচিত অর্থাৎ নাম জানা। বাদ বাকি দেখলেও নাম না জানায় অপরিচিত! যে পাখীগুলো বেশির ভাগ সময় দেখতে পাই সেগুলো হলো, শালিক, টিয়া, ঘুঘু, পায়রা, কাক, বাবুই, বুলবুল, ছাতারে, মাছরাঙা, টুনটুনি, চড়াই, ময়না, কোকিল, বক, শকুনি, চিল, কাঠঠোকরা ইত্যাদি।

এর মধ্যে দু একটা সম্বন্ধে আমি লিখতে চেষ্টা করছি। টিয়া—এদের ঠোঁট লাল। শরীর কচি কলাপাতা রঙের লোমে ঢাকা। এরা সাধারণত দল বেঁধে থাকে। ঝাঁক বেঁধে ওড়ে। তখন এদের দেখতে খুব ভাল লাগে। ওরা দল বেঁধে ফলের বাগানে চড়াও হয়। পাকা ফল খায় আর নষ্ট করে। এরা কাঁচা লঙ্কা খেতে খুব ভালবাসে। এদের শরীরের রঙের জন্যে গাছে বসলেও এদের দেখা যায় না। অনেকে টিয়া পোষে। এরা খুব ভাল শিস্ দিতে পারে। এদের কথা শেখালে এরা দু একটা কথাও বলতে পারে।

মাছরাঙা—এটিও আমাদের খুব পরিচিত পাখী। এদের ঠোঁট খুব লম্বা। পালকের রঙ সবুজের সঙ্গে লাল ডোরা কাটা। এরা সাধারণত বড় বড় পুকুর বা বিলের কাছে গর্ত করে থাকে। দিনের বেলা গাছের ডালে চুপচাপ বসে থাকে। দেখলে মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু জলের উপর মাছ ভেসে উঠতে দেখলে এরা তীরবেগে গিয়ে ছোঁ মেরে নিয়ে আবার পুরোনো জায়গায় ফিরে আসে। আসলে এরা ছোট ছোট মাছ খায়। এরা সেজন্যে ওভাবে বসে থাকে। এদের থাকার গর্তে অনেক সময় মাছ পাওয়া যায়। মনে হয় খিদে না থাকলে শিকার করা মাছ পরে খাবার জন্যে জমা করে।

টুনটুনি—এই পাখীগুলো খুব ছোট্ট। এদের শরীরের ওপর দিক হলদেটে মাটি বা শুকনো কাঠের রঙের পালক আর পেটের দিকে সাদা লোমে ঢাকা। সাধারণত এরা বাড়ির আশেপাশে ছোট গাছে খড়কুটো দিয়ে বাসা বাঁধে। এরা লাফিয়ে লাফিয়ে এক ডাল থেকে অন্য ডালে যায়। এদের খাবার ছোট ছোট পোকামাকড়, শস্যকণা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ শ্রেণী দক্ষিণ বারাসাত শিবদাস আচার্য হাই স্কুল।

বাস্তবের মুখোমুখি

সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক—স্বাধীনতা যুগে যে শহর কলকাতা সমগ্র ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের ঔদাসীন্য ও অবহেলায় চারিদিক থেকে স্তূপীকৃত নৈরাশ্য তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে।

এই শহরের সমস্যাচিত্র যেমন বিশাল তেমনি ভয়াবহ। আলোবাতাসহীন, অন্ধকার, নোংরা, ঘিঞ্জি বস্তি, খোলা নর্দমা, খাটা পায়খানা, স্তূপীকৃত আবর্জনা, রাতে মশা—দিনে মাছি, পথে কুকুর, ছাড়া গরু, পানীয় জলের অভাব, ফুটপাথের বাসিন্দা, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, ট্রাফিক জ্যাম, হকারি মস্তানি, ভণ্ডামি, ভেজাল ওষুধ, মদের চোরাকারবার, জুয়া, অপসংস্কৃতি সব মিলিয়ে আমাদের টান এক অতলান্ত গহ্বরের দিকে।

কিন্তু তবু এই কলকাতার নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে থেকেই জীবনের শত সহস্র আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে। খেলার মাঠ, ময়দানের সভায় পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশাবাদী মানুষ, সরকার যদি উদ্যোগী হয় তা হলে মানুষ ধৈর্য ধরতে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। তাই আমাদের আবেদন:

(১) জলের অপচয় করবেন না। কলের মুখ খোলা দেখলে বন্ধ করে দেবেন।
(২) নির্দিষ্ট পাত্রে ছাড়া রাস্তায় কোথাও জঞ্জাল ফেলবেন না।
(৩) রাস্তায় বাতিস্তম্ভ থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি ঘৃণ্য অপরাধ।
(৪) দেওয়ালে কুৎসিৎ কিছু লিখবেন না।
(৫) ফুটপাথ পথচারীদের, এখানে কায়েমী সত্ত্ব গড়ে তুলবেন না।
(৬) রাজস্ব আদায় সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি: কর বাকী ফেলবেন না।
(৭) ভেজালকারীদের চিহ্নিত করে সংগঠিতভাবে তার শাস্তি দাবি করুন।

গঠনমূলক সমালোচনা এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করবে।

কলিকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত

কি করে 'জীরোক্স' হয়

সৌমেন চক্রবর্তী

কোনও দরকারী কাগজপত্র বা দলিলের কপি করবার দরকার হলে আমরা সেটাকে 'জীরোক্স' (Xerox) করি।

এই ফটোকপির যন্ত্র কিন্তু মোটেই জটিল নয়। বিদ্যুৎ ও আলোকের যুগ্ম-প্রভাবে সেলেনিয়ামের বিচিত্র প্রতি-ক্রিয়াকেই এই যন্ত্রে কাজে লাগানো হয়। সেলেনিয়াম পদার্থটি এমন, যে একখণ্ড স্থির তড়িৎ-স্পৃষ্ট সেলেনিয়ামের উপর আলো ফেললে সেটা তার বৈদ্যুৎতিক শক্তি হারায়।

এই যন্ত্রে একটি সেলেনিয়ামের চোঙাকে আগে থেকেই স্থির-তড়িৎ-স্পৃষ্ট করে রাখা হয়। লেন্স ও আয়নার সাহায্যে বই বা দলিলের লেখাগুলিকে সেই চোঙের উপর 'ফোকাস' করা হয়। ছাপা অক্ষরের প্রতিবিম্ব পড়া জায়গাগুলি অন্ধকার থাকায় সেখানকার সেলেনিয়াম তখনও তড়িৎ-স্পৃষ্ট থাকে। কিন্তু বাকি জায়গা তড়িৎ-শক্তি হারায়।

এরপর বিশেষ ধরনের গুঁড়ো কালি ওই সেলেনিয়ামের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থির-তড়িতের স্বভাবই হচ্ছে হাল্‌কা জিনিসকে আকর্ষণ করা। তাই অক্ষরের প্রতিবিম্ব পড়া অন্ধকার জায়গাগুলি কালি টেনে নেয়। বাকি জায়গা থেকে কালি ঝরে যায়।

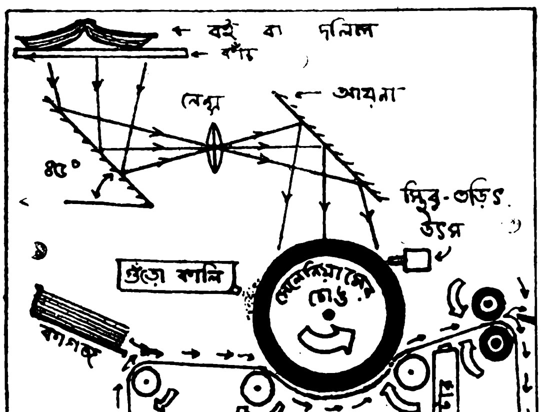

তারপরের ব্যাপার খুব সহজ। সঠিক মাপের কাগজ চোঙের গায়ে চেপে ধরা হয়। কাগজের উপর বইয়ের পাতার বা দলিলের অবিকল কপি হয়ে যায়। এরপর কাগজটাকে একটু তাতিয়ে কালিটাকে গলিয়ে ছাপটাকে পাকা করা হয়।

ডন বস্কো স্কুল, অষ্টম শ্রেণী, কলকাতা-19

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের বই

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন

প্রথম খণ্ড ঃ একাদশ শ্রেণী

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ দ্বাদশ শ্রেণী

প্রবীণ অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ইতিবৃত্তিকা ১ম

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য

ইতিবৃত্তিকা ২য়

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য

জহরলাল গুহ ও নীলোৎপল শ্যাম

মাধ্যমিক ভূগোল (১)

নবম শ্রেণীর পাঠ্য

মাধ্যমিক ভূগোল (২)

দশম শ্রেণীর পাঠ্য

অধ্যাপক নীরেন সেন-এর

ভূগোল পরিচয়

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য

দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রণীত

বাংলা সহায়ক পাঠ

কাহিনী পরিচয় (১) ৬ষ্ঠ

কাহিনী পরিচয় (২) ৭ম

গল্প বিচিত্রা ৮ম

নমুনা কপির জন্য লিখুন

দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস্

৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সেফটি-ল্যাম্প আবিষ্কারের নেপথ্যে

চৈতালী ঘোষ

তোমরা হয়তো জানো যে, কয়লাখনির ভেতর একরকম গ্যাস সৃষ্টি হয়, যার নাম 'ফায়ার ড্যাম্প'। এই গ্যাস সামান্য জ্বলে গেলেই তা কয়লাখনির ভেতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। এই ধরনের বিস্ফোরণে বহু শত খনিশ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। বর্তমানে এই গ্যাস থেকে খনিমানুষদের বাঁচাবার জন্যে যে নিরাপত্তা বাতি ব্যবহার করা হয় তার আবিষ্কারের নেপথ্য কাহিনী এখানে বলছি।

নিরাপত্তা বাতি হলো এমন জিনিস, যা খনির ভেতরে কাজ করবার সময় শ্রমিকদের প্রাণরক্ষার একমাত্র আশ্রয় বলা যেতে পারে।

যদি খনির মধ্যে ফায়ার ড্যাম্প থাকে, এই বাতির হলুদ শিখার চারপাশে নীল শিখা জ্বলে ওঠে। ফলে খনি কর্মীরা বুঝতে পারেন যে, এবারই বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। এইভাবেই দিনের পর দিন বিপদের হাত থেকে তাঁরা নিজেদের রক্ষা করেন।

ইংল্যাণ্ডে 'ওয়েষ্ট মুর' নামে একটি দেশ আছে। সেই দেশটি কয়লাখনি উৎপাদনে এত সমৃদ্ধ যে, তাকে কয়লা-খনির দেশ বলা হয়। সেখানকার কোলিয়ারিতে 1806 খ্রীষ্টাব্দে ও 1809 খ্রীষ্টাব্দে পরপর দুটো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে প্রায় বাইশ জন শ্রমিক প্রাণ হারান। সেইদিনের সেই দুর্ঘটনা প্রতিটি মানুষকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। দিনের পর দিন খনিশ্রমিকরা এই বিস্ফোরণের শিকার হতে লাগলেন। ফলে খনির কাজ করাটাই প্রতিটি মানুষের কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো। ইংল্যাণ্ডের কাছে এই সমস্যা জাতীয় সমস্যারূপে দেখা দিল। এই সময় এক খনির 'মেকানিক' এই সমস্যাটি নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর সহকর্মীদের অসহায় মৃত্যু-দশাটাই হয়তো এই সম্বন্ধে চিন্তার স্পৃহা তাঁর মনে জাগিয়ে দিয়েছিল।

এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে প্রথমে তিনি খনি-গর্ভের সমস্ত বিপজ্জনক স্থানগুলি পর্যবেক্ষণ করলেন এবং অস্থায়ীভাবে কিছু সমাধানের উপায় দেখালেন। কাজের সুবিধার জন্যে সন্দেহজনক জায়গার চারিধারে উঁচু দেওয়াল তোলার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু মূল সমস্যার কোনো সমাধান বিশেষ হলো না। তখন সেই মেকানিক অন্য উপায়ের চেষ্টা চালাতে লাগলেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখি তিনি ছিলেন কিলিংওয়ার্থের সামান্য একজন মেকানিক। কোনো নামজাদা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁর হয় নি। সেজন্যে কোনো ফরমূলার মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ এবং সাধারণ অভিজ্ঞতাকেই অবলম্বন করে এই জাতীয় সমস্যাটির সমাধানে ব্রতী হয়েছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই একটি মোমবাতি নিয়ে তিনি খনিগর্ভের মধ্যে পরীক্ষা শুরু করলেন। বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখলেন যে, জ্বলন্ত মোমবাতির শিখাকে গ্যাসের জ্বালামুখের কাছাকাছি রাখলে শিখার নিচের দিকে একটা নীলচে আভা দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁর সাধারণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অন্তত পক্ষে এটুকু বুঝলেন যে, এই নীল শিখাটিই বিস্ফোরক গ্যাস। সুতরাং বাতির শিখাকে ধেয়ে আসা বায়ুর গতি থেকে রক্ষা করতে হবে। সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ফায়ার ড্যাম্পের আসল উৎস-রহস্যটাই সেই মেকানিক ভদ্রলোক আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য 'সেফটি-ল্যাম্প' বা নিরাপত্তা বাতির কথাও তিনি ভাবতে শুরু করলেন। এই বিশ্ববিখ্যাত প্রবাদপুরুষটি কে জানো? রেলগাড়ির আবিষ্কর্তা জর্জ স্টিফেনসন।

এরপর স্টিফেনসন এই আবিষ্কারের কথা তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে জানালেন এবং তাঁকে দিয়ে ঐ বাতিটির একটি ছবি আঁকিয়ে নিলেন। ফলে মানসিক চিন্তাধারা রূপ নিল অঙ্কনের পাতায়। অবশেষে ম্যানুজ নামে এক কামার তাঁর কামারশালায় এই বাতিটির পরিপূর্ণ রূপ দান করলেন। বাতিটিকে একটি কাঁচের চিমনি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো আর একটি সরু নলের সাহায্যে বাইরের বাতাসের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করার ব্যবস্থাও করা হলো। শুরু হলো পরীক্ষা। 1815 সালের 21শে অক্টোবর কিলিংওয়ার্থের বার্সপিট নামে এক খনিগর্ভে বাতিটিকে

পরীক্ষা করা হলো। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্টিফেনসনের সেই বন্ধুটি এবং ঐ খনিগর্ভের একজন পর্যবেক্ষক। স্টিফেনসন একাই নামলেন সেই ভয়ংকর বিপজ্জনক খনিগর্ভে। কিছুক্ষণ পর তাঁর চিৎকার শুনে সহযোগীরাও গিয়ে উপস্থিত হলেন সেই খনিগর্ভে এবং দেখলেন, স্টিফেনসনের বাতিটি গ্যাসের আধিক্যে নিভে গেছে। তবে পরীক্ষাটি সফল হয়েছে। এরপর স্টিফেনসন বাতির সেই সরু নল বাদ দিয়ে, একটি ধাতব পাত চারপাশে বসালেন।

সেইসময় বিশিষ্ট রসায়নবিদ স্যার হামফ্রী ডেভিকে এই জাতীয় সমস্যাটি সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। 1813 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের একটি সমিতি ডেভিকে এই গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সুতরাং ডেভি ফায়ার ড্যাম্পের একটি নমুনা খনি থেকে সংগ্রহ করে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, 'খনির ভেতর ফায়ার ড্যাম্পের অবস্থানের জন্য তারজালি দেওয়া নিরাপত্তা বাতি ব্যবহারই শ্রেয়।' তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষা করা হলো। স্টিফেনসনের নিরাপত্তা-বাতি পরীক্ষার প্রায় দু'মাস পরে এই পরীক্ষা শুরু হলো। 1816 খ্রীষ্টাব্দের 11 জানুয়ারী ডেভির নিরাপত্তা বাতিটি প্রথম কাজে লাগানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে এই কাজের প্রশংসা বহু জায়গা থেকে বহু মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে উঠতে লাগলো। সমিতি থেকে ডেভিকে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে পুরস্কৃত করা হলো। কিন্তু দু'মাস আগের প্রকৃত আবিষ্কর্তার কৃতিত্বের মূল্য কেউ দিলেন না। সকলেই ভাবলেন, স্টিফেনসন মেকানিক, তাঁর পক্ষে এই সাফল্য অসম্ভব। সমিতির সভ্যরা এ ব্যাপারে স্টিফেনসনকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে নারাজ হলেন। তাঁরা রটাতে লাগলেন, 'এটি একটি বিশৃঙ্খল প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।' তাঁরা মনে করলেন, ডেভির আবিষ্কারের কোনো পরিকল্পনা পূর্বে থেকে জানতে পেরেছিলেন।

এই ঘটনায় স্টিফেনসন অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁর অনুরাগীরা বিভিন্ন সংবাদপত্রে সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে লাগলেন। স্টিফেনসনের সেই দুঃখের দিনে তাঁর সেই বন্ধুরাই নিউ ক্যাসেল অ্যাসেম্বলী হলে তাঁকে এই কৃতিত্বের জন্যে পুরস্কৃতও করলেন। এতে ডেভি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। বাদ-প্রতিবাদের বহু চিঠিপত্র চলতে লাগলো। সবশেষে স্টিফেনসনের আবিষ্কৃত বাতিটিকে 'দুরডিক' অ্যাখ্যায় ভূষিত করা হলো। যদিও তুলনামূলকভাবে ডেভি ও স্টিফেনসনের বাতির গুণাগুণ প্রায় একই, তবুও আজও খনির মালিকেরা স্বল্প আলোর প্রয়োজনে 'দুরডিক' এবং উজ্জ্বল আলোর প্রয়োজনে ডেভির বাতি কাজে লাগান।

17A, কার্তিক বোস লেন, কলিকাতা-6

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২.৫০ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২৫ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

৩য় ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য

By Roy & Reeves

Habit of English

P-I for III P-II for IV P-III for V

নমুনা কপির জন্য লিখুন

RANJAN PROKASHAN

8/1A Shyama Charan Dey St. Cal-73

পরের দিন ১৮ই নভেম্বর। বিছানা ছেড়ে অ্যারোনেক্স উঠে এলেন জাহাজের সিঁড়ে। কয়েকজন নাবিক ইতিমধ্যে জাল ফেলে মাছ ধরতে শুরু করেছে।
সাগর তলের এই বৈচিত্রময় জীবন-স্পন্দন আপনার মনকে নাড়া দেয়না প্রফেসর? কাল রাতে যেন আমাদের মতই নিদ্রায় মগ্ন ছিল, অথচ দেখুন সূর্যের উষ্ণ চুম্বন পেয়ে কেমন ঝলমল করছে এখন।
সাগরের স্রোতের সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে সময় বয়ে যায়। ১১ই ডিসেম্বরের কথা, অধ্যাপক তখন বই খুলে তন্ময় ...
স্যার, এদিকে একবার দেখবেন?
একী! এ যে নিমজ্জিত এক জাহাজ!
ঐ তো, জাহাজের নাম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি – 'দি ফোরিডা সান্ডারল্যান্ড।'
গৌতম কর্মকার

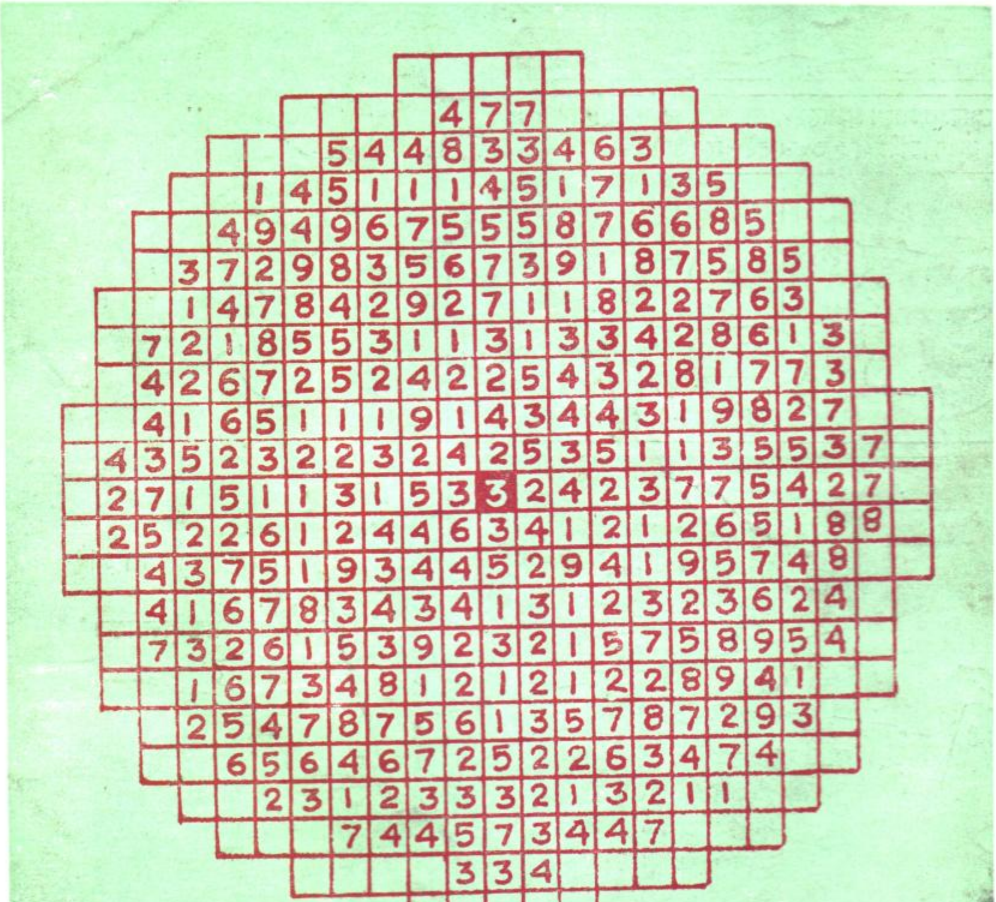

গোলক ধাঁধা : সিদ্ধার্থ ঘোষ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদমুদ্রণ : রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২